সাধক জীবন ও নারী

অজিতানন্দ

শরৎ পাবলিশিং হাউস
কলিকাতা-৯

কুণালমাতাকে

অজিতানন্দ

প্রথম খণ্ডে আলোচ্য জীবন

গৌতম বুদ্ধ

শ্রীচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ

নিবেদন

'সাধক জীবন ও নারী' সাধকের জীবন-কথা। সাধনা সাধকের কীর্তি। কীর্তির চেয়ে কর্তা মহৎ। তাই সাধকের জীবন সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ আগ্রহ।

জীবনে প্রথম নারী জননীর আকুল করা কথা সবিশেষ লিখেছি। সব সাধকই মাতৃস্তন্যে লালিত মাতৃস্নেহে পালিত। যদি গর্ভধারিণী মারা যান, তাহলে আর কোন নারী সাধকের স্তনদায়িনী; তিনিও জননী, যেমন গোতম বুদ্ধের মাতা গোতমী।

জননীর শিক্ষা দীক্ষা সাধক চরিত্র নির্মাণ করে; তিনিও দীক্ষাগুরু। গোতমী সিদ্ধার্থকে বলেছিলেন, মারার চেয়ে বাঁচানো মহৎ, শচী নিমাইকে বলেছিলেন, তুমি দেবাবিষ্ট সাধারণ নও। চন্দ্রমণি গদাধরকে বলেছিলেন, আমার কথা ভাবিস নি। এসব কী সহজ কথা? বক্ষে যে বাঁশী বাজে সে কী সহজ সুর?

সাধক মাত্রেই ভাবুক। এবং বালোই। মা, মাসী, পড়শী যা বলে তা নিয়ে ভাবে। তাই কৃশাগোতমীর, মালিনীর, হেমাঙ্গিণীর এবং আরও অনেকের আসল কথা লিখেছি।

শুধু কথা নয়, তাদের স্নেহ প্রীতি মায়া মমতা। নারীর এক হৃদয়ে কত রস, যেমন এক অঙ্গে কত রূপ। মাসীপিসীর পরিণত স্নেহ, দিদি বোনের উচ্ছল প্রীতি প্রতিবেশিনীর হাস্য কৌতুক। এতরস শুধু নারীহৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। এবং বিচিত্র ধারায়।

সেই রসে পুষ্ট হয়ে বালক একদিন যৌবন লাভ করল; তখন জীবনে আসে জায়া। বুদ্ধের জীবনে এসেছিল গোপা, নিমাইয়ের জীবনে বিষ্ণুপ্রিয়া, রামকৃষ্ণের জীবনে সারদা।

গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদামণির প্রেম বর্ণনা করার চেষ্টা সাবধানে করেছি, রসশাস্ত্রের দুটি কথা সবক্ষণ মনে রেখে। এক, চন্দ্রাবলী হল

কামরাধা আর বৃষভানু নন্দিনী হল প্রেমরাধা। দুই, আত্মসুখ প্রীতিইচ্ছা সেই হয় কাম, কৃষ্ণ সুখ প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। এই তিন রমণী প্রেমময়ী হয়েও এক নয়। প্রেম বিচিত্র।

জননীর স্নেহে ও জায়ার প্রেমে কিবা বুদ্ধ কিবা শ্রীচৈতন্য কিবা শ্রীরামকৃষ্ণ অভিষিক্ত। কতখানি তা কতিপয় গ্রন্থপাঠে বুঝেছি। এবং এই গ্রন্থে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

আর এক কাজ, সাধকের জীবন অনুধাবন করলে যা মনে হয় তা ব্যক্ত করা। গোতমবুদ্ধ গোপাকে ত্যাগ করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে গেলেন, শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে প্রেমধর্ম প্রচার করতে বেরোলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে জগন্মাতা জ্ঞানে পুজো করে বারংবার বললেন, কামিণীকাঞ্চন ত্যাগ কর। এ সবই ঘটনা। জানলাম কিন্তু জানার পর কী মনে হল ?

মনে হওয়ার ওপর হাত নেই। সিদ্ধার্থের জীবন ও গোতমবুদ্ধের শিক্ষকোচিত উপদেশ অনুধাবন করে মনে হল, এক বিপন্ন বিস্ময় তাঁর অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করছিল, আর তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন। এই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য এক মহতী চেষ্টা তাঁর। তিনি নারীকে ভালবেসে দেখেছেন, অবহেলা করে দেখেছেন, ঘৃণা করে দেখেছেন। তারপর গোপাকে ও অন্যান্য রমণীকে ছেড়ে চলে গেছেন।

আর নিমাইয়ের জীবন ও শ্রীচৈতন্যের বিরহ অনুধাবন করে মনে হল, তিনি মানুষকে এমন ভালবাসলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়া সে স্রোতে বুঝি ভেসে যায়। মহাপ্রেমী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভাসতে দিলেন না। এই ভাসতে না দেওয়ার কী মহৎ প্রয়াস। পার্ষদদের দিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন, খড়ম খুলে দিচ্ছেন, রাজা প্রতাপ রুদ্রের দেওয়া শাড়ী পাঠাচ্ছেন বছরের পর বছর।

আর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কথামৃত অনুধাবন করে মনে হল, এই সাধক অসীম সাহসী। তিনি স্ত্রীকে ভোগ করলেন না ঠিকই

কিন্তু ত্যাগও করলেন না। সারদামণি রামকৃষ্ণের সহধর্মিনীই রইলেন। আর ছেলেয় ছেলেয় সারদার বুক ভরে দিলেন।

জায়া ও জননী ছাড়া আরও নারী আসে সাধকের জীবনে। বুদ্ধের জীবনে এসেছিল সুজাতা, বিশাখা, আম্রপালি আরও অনেকে। সেবায়, মমতায় উজাড় করে দেওয়া দানে তারা তথাগতের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবনে এসেছিল মালিনী, সীতা, মাধবী আরও অনেকে। মহাপ্রভু সাড়ে তিনজনের কথা উপর্যুপরি বলেছেন। তাদের একজন মাধবী। মহাপ্রভু মাধবীকে সম্ভাষণ করার অপরাধে ভক্ত হরিদাসকে ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এসেছিল রাসমণি, জগদম্বা, অঘোরমণি আরও অনেকে।

সাধক জীবনে তিন নারীর কথা হল। জননী, জায়া ও অনুরাগিনী যদি এখানেই শেষ হত তাহলে বেশ হত কিন্তু তা হল না। হায়!

বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের জীবনে কতিপয় নারী এসেছিল, যারা শুধুই কামিনী। বুদ্ধের জীবনে চিঞ্চা, সুন্দরী, মাগন্দিয়া, চৈতন্যের জীবনে বারমুখী, সত্যবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ। রামকৃষ্ণ জীবনে তিনটি সুলভ রমনী। এই গ্রন্থে এদের কথাও আছে, কাহিনীও আছে।

পরিশেষে নিবেদন। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দুর্লভ পুরুষ। 'সাধক জীবন ও নারী' পাঠের সময় মনে রাখতে হবে বিষয়: সাধক জীবন। এঁদের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, ভাব অনুভূতি, বিচার বিবেচনা এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে আগ্রহী হলে ধন্য হব।

যে গ্রন্থগুলি সহায়—ললিত বিস্তর, জাতক উপক্রমণিকা, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত। সারাদানন্দ স্বামীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, মহেন্দ্র গুপ্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অক্ষয় সেনের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

[এক]

বৈশাখ মাস। পল্লব-ঘন লুম্বিনী অরণ্যে শালবৃক্ষ থেকে ফুল ঝরছে অবিরল। যেন পুষ্পবৃষ্টি নবজাতকের ওপর। অরণ্যে যার জন্ম সে কী আর গৃহী হবে? জাতকের নাম সিদ্ধার্থ। পুত্র কামনা সিদ্ধ হওয়ায় পিতা-মাতা এই নাম রাখলেন। শাক্য সিংহ সিদ্ধার্থ।

পিতা শুদ্ধোদন কপিলাবস্তুর ভূস্বামী। তাঁর অনেক জমি আর জমিতে ভাল ধান হয়, তাই নাম শুদ্ধ-ওদন। শুদ্ধোদন ভূস্বামী হলেও রাজার মত বিত্তবান্। একাধিক স্ত্রী, রাজধানীও আছে। তিনি ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত।

মাতা মায়াদেবী রূপে তুলনাহীনা। এমনই তাঁর রূপলাবণ্য যে রক্ত মাংসের শরীর বলে মনে হয় না, যেন চাঁদের আলোয় গড়া। কায়া নয় মায়া। কথিত আছে, চিত্ত বিভ্রমকারী রূপের জন্য এই নাম তাঁর। সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মায়াদেবী মারা গেলেন। বাড়ীতে এলেন জ্যোতিষী। নবজাতকের দেহ পরীক্ষা করে বললেন, এক বিশাল প্রাণ জন্মগ্রহণ করেছে। সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ।

তা এখন মহাপুরুষকে স্তন দেয় কে?

শুদ্ধোদনের এক স্ত্রী গোতমী, মায়াদেবীর বোন। তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই স্তনদায়িনীকে বলা হয়েছে মহাপ্রজাবতী. কারণ তিনি বুদ্ধের মত প্রজা (সন্তান) পালন করেছিলেন।

সিদ্ধার্থ মাতা গোতমীর হাতে খেয়ে কোলে শুয়ে বড় হয়। বালক বড়ই সুবোধ, চুপচাপ থাকে, লেখাপড়া করে, কারও সাথে বিবাদ করে না।

একদিন বিবাদ হলো খুড়তুতো ভাই দেবদত্তের সঙ্গে। বিষয়ঃ

অধিকার। শিকার ধরে দেবদত্ত বলল—এ হাঁস আমার। সিদ্ধার্থ আহত হাঁসের শুশ্রূষা সেরে বলল—এ হাঁস আমার। কার অধিকার বেশী?

মহাপ্রজাবতী গোতমী দুবার ভাবলেন। প্রথমবার বুদ্ধি দিয়ে বিচার। দেবদত্ত ঠিকমত তীর ছুঁড়তে না পারলে উড়ে চলা হাঁস উড়েই যেত। শিকারীর অবশ্যই অধিকার আছে শিকারের ওপর। বুদ্ধির পর হৃদয় দিয়ে বিচার। শিকার হংসী না হয়ে যদি হত নারী? যে দুরাত্মা নারীকে বলাৎকার করে সে তাকে পায়, না যে মহাত্মা তাকে ভালবাসে সে তাকে পায়? মহাপ্রজাবতীর মাতৃহৃদয় বলল: মহাত্মা অবশ্যই তাকে পায়।

তিনি দেবদত্তর দিকে তাকালেন—তুই কী করেছিস?

—মেরেছি।

তিনি সিদ্ধার্থের দিকে তাকালেন—তুই কী করেছিস?

—বাঁচিয়েছি।

মহাপ্রজাবতী বিবাদ মিটিয়ে দিলেন ওদেরই কথায়। বললেন—মারার চেয়ে বাঁচানো অনেক মহৎ। সুতরাং সিদ্ধার্থেরই অগ্রাধিকার।

সিদ্ধার্থের মহানন্দ। মা যথার্থ বলেছে। মারার চেয়ে বাঁচানো অনেক মহৎ। মনে মনে বলে: মাগো, আমি বাঁচাব। মানুষকে সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে আমি বাঁচাব।

সমবয়েসী ছেলেদের সঙ্গে সিদ্ধার্থ মাঠে খেলতে গিয়েছে। খেলায় তেমন মন নাই। মাঠের দক্ষিণ সীমানায় বন। বালক সেখানেই গেল ভাবতে ভাবতে। মানুষের দুঃখ শরীর নিয়ে। খিদে বা তেষ্টা পেলে দুঃখ। কেটে বা পুড়ে গেলে দুঃখ। ঠাণ্ডা বা গরম লাগলে দুঃখ। অসুখ বিসুখ করলে দুঃখ। শরীরটাকে নিয়ে কী করা যায়?

বালক সিদ্ধার্থ ছাতামেলা গাছতলায় বসে ভাবছে। এদিকে সূর্য অস্ত যায়। খেলাশেষে সঙ্গীরা বাড়ি ফেরে। মা গোতমী সিদ্ধার্থকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল। কোথায় গেল সে আপনভোলা? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। খোঁজাখুঁজি করতে দাসদাসী অবাক। বালক গাছ-

তলায় গভীর চিন্তায় মগ্ন, যেন কোন ধ্যানরত তপস্বী। বলবান দাস সিদ্ধার্থকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল বাড়িতে। এই নাও তোমার হারানো মানিক। মা গোতমী বললেন—তুই কীরে?

—তাই তো ভাবছিলাম। তুমি জানো মা, আমি কী? আমার শরীর কেন? কী করে দুঃখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

মা গোতমী মাথা নাড়লেন। এসব প্রশ্নের উত্তর তিনি জানেন না। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বললেন—দুঃখ ত্রিবিধ। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক দুঃখ নিবারণের জন্য সিদ্ধার্থকে যথাসম্ভব সুখে রাখুন।

মাতা গোতমী ও পিতা শুদ্ধোদনের দৃঢ়সঙ্কল্প পুত্র সিদ্ধার্থকে সুখে রাখার বিবিধ ব্যবস্থা করবেন। তা সে যত খরচ হয় হোক।

তিনটি প্রাসাদতুল্য ভবন নির্মিত হল। ভবনগুলি বিভিন্ন ঋতু উপযোগী। হৈমন্তিক ভবন সুখোষ্ণ, গ্রৈষ্মিকভবন সুখশীতলা আর বার্ষিকভবন বারিবিমুখ। সিদ্ধার্থের শীতকালে ঠাণ্ডা লাগে না গ্রীষ্মকালে গরম লাগে না। আর বর্ষাকালে তিনি দ্বিতলেই থাকেন, সুতরাং বৃষ্টিতে পা পর্যন্ত ভেজে না।

আর এক ব্যবস্থা আহার্যের আয়োজন। সিদ্ধার্থের জন্য রাঁধা হয় সুগন্ধি সালি চালের ঘৃত পক্ক মাংসোদন, রুচিকর ব্যঞ্জন, কোমল পিস্টক ও দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন। বিভিন্ন ফলের নির্যাস থেকে সুরাসার। সুতরাং খিদে তেষ্টার দুঃখ তার নাই।

সিদ্ধার্থ পরমভোগে আছেন। তিনি কাশীর চন্দন ছাড়া অন্য চন্দন ব্যবহার করেন না। কাশীর সূক্ষ্ম উত্তরসঙ্গ ছাড়া অন্য উত্তরসঙ্গ পরিধান করেন না। তাঁর আয়েসের জীবন, শরীরের কোন অংশ কেটে বা পুড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। বৈদ্যের নির্দেশমত চলেন, অসুখবিসুখ বিশেষ করে না।

সিদ্ধার্থ ভবনের উদ্যানে পায়চারি করেন। অশোক বা বকুল বা চম্পক বৃক্ষতলে বসেন, যূথী মল্লিকা লতা বিতানে শুয়ে থাকেন। পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে পদ্ম উৎপল পুণ্ডরীক।, তিনি স্নানের সময় পুষ্পশোভা নিরীক্ষণ করেন।

সিদ্ধার্থ এক দণ্ডও একলা থাকেন না। নৃত্যগীত পটিয়সী সুন্দরীরা তাঁর মনোরঞ্জনে সদা ব্যস্ত। রসিকা রূপসীরা তাঁর চিত্ত বিনোদনে তৎপর। গান শুনে নাচ দেখে হেসে খেলে দিন কেটে যায়। তবু সিদ্ধার্থের প্রাণ কাঁদে। ভাল লাগে না।

শুদ্ধোদন ছেলের বিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন।

পুরবাসীজন বলাবলি করে—সিদ্ধার্থ দুর্বল অক্ষম ভোগজীর্ণ। এমন পুরুষকে কন্যাদান করা অনুচিত। এ কথা সিদ্ধার্থের কানে গেল। তিনি গর্জন করেন, আমি ভোগজীর্ণ?

বৃষস্কন্ধ কবাটবক্ষ মহাভুজ সিদ্ধার্থ বিশাল এক হাতী দেখিয়ে বললেন—কোন্ শাক্যযুবা এই হাতীর পিঠে চড়তে পারে?

যুবকেরা নীরব। কারণ এই হাতী শুধু বিশাল নয়, মদমত্তও বটে। তখন সিদ্ধার্থ বীরপায়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে যাদুদণ্ড ছিল না কিন্তু এমন কিছু ছিল যার জন্য ইসারা করতে হাতী হাঁটু গাড়ে, আর তিনি তার পিঠে চড়ে বসেন।

সাধু সাধু রব পড়ে যায়।

গুরুজনেরা সিদ্ধার্থকে বিয়ের কথা বললেন। তিনি আপত্তি করলেন না। বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি আচার্যগণ সপত্নীক সাধনা করে আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, কাজেই বিয়ে করতে আপত্তি কি? তবে পত্নী মৈত্রেয়ী অরুন্ধতীর মত পতির মনোবৃত্তি অনুসারিনী হওয়া প্রয়োজন। বললেন—উচ্চমন ও বিনীত স্বভাব কন্যা পেলে বিয়ে করি।

ঘটকেরা নিকটে ও দূরে, স্বদেশে ও বিদেশে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান

করে, এবং নিকটে ও স্বদেশেই পাওয়া যায় এক রূপবতী ও গুণবতী কন্যা। কথিত আছে, শুদ্ধোদন ভবনে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত শাক্য কুমারীদের মধ্যে এক তরুণী সিদ্ধার্থের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কে এই তরুণী?

নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন ইনি সুপ্রবুদ্ধ কন্যা, কেউ বলেন ইনি অমৃতোদন কন্যা। সিদ্ধার্থের মামাতো অথবা খুড়তুতো বোন ইনি। ললিত বিস্তর'এ এঁর অনেক নাম। ভদ্রা, বিম্বা, গোপা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা। কে জানে এতগুলি নাম হয়ত একজনের নয়। সে যুগে বিত্তবান্‌দের অনেক স্ত্রী থাকত, সিদ্ধার্থেরও হয়ত ছিল। সে যুগে বিত্তবানেরা, মনোনীতা কন্যার সখী সহচরী পরিচারিকাদেরও বিয়ে করতেন, হয়ত সিদ্ধার্থও করেছিলেন।

সিদ্ধার্থ আগের মত হৈমন্তিকভবনে শীতকাল, গ্রৈষ্মিকভবনে গ্রীষ্মকাল এবং বার্ষিকভবনে বর্ষাকাল কাটান।

এখন গ্রীষ্মকাল। সিদ্ধার্থ ও গোপা নৌকা বিলাসের পর ভবনে ফিরেছেন। গোপা বলে—আর্যপুত্র! আপনি মাঝে মাঝে এত কী ভাবেন?

—তুমি শুনতে চাও?

—চাই। আপনি যা ভাবেন তা আমিও ভাবব।

—উত্তম কথা। সিদ্ধার্থ পত্নীর চোখে চোখ রাখলেন—আমি জরা ব্যাধি মৃত্যুর কথা ভাবি। যতই ভোগসুখে থাকি না কেন জরাগ্রস্ত হবই, মৃত্যুও নিশ্চিত। যৌবন আর ক'দিনের?

—আর্যপুত্র! যত দিনেরই হোক, যৌবন যৌবন, জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল।

—জানি। কিন্তু জরা, ব্যাধি, মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, ভাবলে আমার যৌবনের মদ আর থাকে না।

গোপা নতমুখে রইল।

গোপা জানে, কোন কোন বিত্তবান যুবক বিলাস ব্যসনে বীতরাগ হয়ে এসব কথা ভাবেন। এবং ঘরে নিবিড় ভাবনার সুবিধা না থাকলে সংসার ত্যাগ করেন। এমন যুবক কাশীর পার্শ্বনাথ এবং বৈশালীর মহাবীর। ওঁরা নিজস্ব চিন্তায় বিশিষ্ট। অসাধারণ, মানুষের মত মানুষ।

গোপার সুন্দর মুখে বিষাদ ছড়িয়ে যায়। তাই বলে কী ওঁরা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম পালটে দিতে পারেন? পারেন না। তা হলে চিন্তায় কী লাভ? অন্যমনস্ক গলায় বললেন—আর্যপুত্র! রজনীর প্রথম প্রহর যায়। খাবেন চলুন।

চিন্তামগ্ন সিদ্ধার্থ উঠলেন।

*

ললিতবিস্তর গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে এইরকম এক বর্ণনা। রাত্রির তৃতীয় প্রহর। গীত বাদ্যের পর বিনোদিনী রমণীরা অতিশয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। বিপর্যস্ত কেশ স্খলিত বাস ভাঙাচোরা শরীর। মাছের মত স্থির চোখ, হাঁ করা মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে। এসব দেখে সিদ্ধার্থ চমকে উঠলেন। ঘুম ছুটে গেল। কী বিসদৃশ নারীর শরীর। এই শরীর নিয়ে মত্ত হওয়া মূর্খতা। সিদ্ধার্থ নারীকে ভালবেসেছিলেন. অবহেলা করতে শিখলেন।

আরও এক বর্ণনা আছে অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিতে। কপিলাবস্তুর পথে যায় রুগ্ন ব্যক্তি, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তি। এসব সিদ্ধার্থ অনেক দেখেছেন কিন্তু আজ চমকে উঠলেন। কী ভয়াবহ শরীরের পরিণতি।

সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিসদৃশ নারীদেহ অথবা রুগ্ন-জরাগ্রস্ত-মৃত ব্যক্তি দেখে এই বৈরাগ্য? মনে হয় না। স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী আরও বিস্তৃত। তিনি ভাবুক। অনেকদিন থেকেই ভাবছেন।

সিদ্ধার্থ রোজ রথে চড়ে বের হন। নগরের বাইরে কোন অরণ্যে গিয়ে ধ্যানস্থ বসে থাকেন। ফিরবার পথে ভৃত্যের সঙ্গে কথা হয়।

—ছন্দক, তোমার সন্ধানে কোন আচার্য আছেন ?

—আছেন।

—কোথায় ?

—বৈশালীতে।

—তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

—কেন যুবরাজ ?

—আমি দীক্ষা নেব।

ছন্দক কেঁপে উঠল।

সিদ্ধার্থ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম করছেন, গোপাদেবী পদসেবায় নিযুক্তা। তিনি গর্ভবতী, আলস্যের হাই তুললেন। সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগের ইচ্ছা বলতে গিয়েও বললেন না। আহা! গোপার এই অবস্থা। এখন বললে বড় বেশী কষ্ট পাবে। বললেন—তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। শুয়ে পড়।

তবু গোপাদেবী বসে রইলেন। আয়তলোচন অশ্রুভারাক্রান্ত। বললেন—আর্যপুত্র আপনি কি জিনত্ব অভিলাষী ?

—না। আমি বুদ্ধত্ব লাভ করতে চাই।

—তাই প্রতিদিন আপনি নগরের বাইরে যান। আর অরণ্যে গাছের তলায় বসে বহুক্ষণ ধ্যান করেন। আপনি কী গৃহত্যাগ করার কথাও চিন্তা করেন ?

—করি। তবে সারাজীবনের জন্য নয়। বুদ্ধত্ব লাভ করে বাড়ি ফিরব।

—নিশ্চয় ?

—নিশ্চয়।

গোপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

*

কপিলাবস্তুর পুরবাসীজন আনন্দিত। নারীগণ শাঁখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে, ফুল ছড়াচ্ছে। শুদ্ধোদনের ভবনে কলরব আর ব্যস্ততা। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আয়োজিত। পৌত্রলাভ উৎসবের আয়োজন চলছে।

ছন্দক তার প্রভুকে সংবাদ দিল—যুবরাজ আপনি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন।

—রাহুলো জাতো।

বলে সিদ্ধার্থ গম্ভীর। তিনি আনন্দিত হতে পারছেন না। রাহুল অর্থাৎ শত্রু জন্মেছে। কারণ পুত্র তো আর এক বন্ধন।

পুরবাসীজন তা মনে করে না। তারা নবজাতকের পিতার দাক্ষিণ্য পেতে অস্থির। সুতরাং সিদ্ধার্থকে উঠতে হয়।

পরিচারিকারা তাঁকে মনোহর বেশে সাজিয়ে দিলে তিনি উৎসবে যোগ দিতে চলেছেন। ভবনের বাতায়নে শাক্য নারীরা মুগ্ধ চোখে দেখছে তাঁর পুরুষালি রূপ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে কৃশা গোতমী নামে এক তন্বী সিদ্ধার্থকে দেখে বলে উঠল—নিব্বুতো তুমি, নিব্বুতো তোমার বাবা, নিব্বুতো তোমার মা, নিব্বুতো তোমার স্ত্রী।

এতবার নিব্বুতো শুনে সিদ্ধার্থ ভাবলেন, আহা কৃশা গোতমী কী ভাল, কেমন ছল করে নির্বাণের কথা মনে করিয়ে দিল। তিনি গলার মুক্তোহার খুলে কৃশা গোতমীকে দিলেন।

উপহার পেয়ে গোতমী ধন্য, কারণ এ উপহার কৃতজ্ঞতার স্মারকমাত্র মনে হল না কৃশা গোতমীর। মনে হল প্রণয় উপহার।

গোপা রাহুলকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। মাতা পুত্রের মুখের বড় মিল। কপালের গড়ন চিবুকের ডোল হুবহু এক।

রাহুল মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন গোপা ওকে শুইয়ে দিয়ে দাসীকে পাখা করতে বললেন।

গোপা বাইরে এসে দেখলেন স্বামী চুপচাপ। এত চুপচাপ যে চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ে না।

সিদ্ধার্থ গভীর গলায় বললেন—রাহুল মাতা, চজে মত্তা সুখং ধীরো সম্পস্সং বিপুলং সুখং।

—বুঝলাম না।

—শোন। ধীরব্যক্তি সীমাবদ্ধ সুখ ত্যাগ করে বিপুল সুখের সন্ধান করে। আমিও বিপুল সুখের সন্ধানে বেরব এবার।

গোপা শিউরে উঠলেন। যে ভয় করেছিলেন তাই। একটু ভেবে বললেন—আর্যপুত্র! পিতার অনুমতি নিয়েছেন?

—নেব। তোমার আপত্তি আছে?

—না। আপনার যা অভিরুচি তাই করবেন। আপনি তো চিরতরে যাচ্ছেন না, বুদ্ধত্ব লাভ করে আবার গৃহে ফিরবেন। আমি আপনার পথ চেয়ে থাকব। যতদিন না ফিরছেন, কুশলসংবাদ পাবো তো?

—মনে হয় পিতা সে ব্যবস্থা করবেন। আমার সংবাদ পাবে।

গোপা অপলক সিদ্ধার্থের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের অনুমতি চাইতে শুদ্ধোদন কাঁদতে লাগলেন। মাতা গোতমীও। দুজনে সিদ্ধার্থকে কত বোঝালেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সিদ্ধার্থ যাবেনই তবে আরও কিছুদিন পর।

শুদ্ধোদন বৈরাগ্যবান্ পুত্রের মত পরিবর্তনের আশায় আরও রুচিকর আহার্য, নিত্যনূতন ক্রীড়াকৌতুক ও সৌম্যতরা সুন্দরীর ব্যবস্থা করলেন। যিনি বিপুল সুখের জন্য কৃতসঙ্কল্প তিনি কী আর মত পরিবর্তন করেন? সিদ্ধার্থ মাথার কুঞ্চিত কেশদাম কাটালেন। সকলেই জানল, সময় নিকট হয়েছে এবার।

দারা পুত্র পরিবারের চোখের সামনে দিয়ে গেলে ওরা মনে কষ্ট পাবে, কাঁদাকাটাও করবে, চিন্তা করে সিদ্ধার্থ রাত্রির মধ্যযামে উঠলেন। সহসা মনে হল রাহুলকে দেখে আসি। তিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে দুর্বল ইচ্ছা দমন করলেন। একী! তবু সেই ইচ্ছা মাথা তোলে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। গোপার বাহুতে রাহুলের মুখ খানিকটা ঢাকা পড়েছে। ইচ্ছা করে হাতটা সরিয়ে

রাহুলের মুখ দেখেন। তিনি শপথ উচ্চারণ করার মত বললেন : না। এখন না। বুদ্ধত্ব লাভের পর রাহুলের মুখ দেখব।

ভৃত্য ছন্দককে নির্দেশ দেওয়াই ছিল। সে প্রভুর প্রিয় অশ্ব কন্টককে প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে। রজনীর মধ্যযামে সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু ত্যাগ করলেন।

[দুই]

উনত্রিশ বয়সের সৌম্য দর্শন যুবক স সারত্যাগী। অশ্বারূঢ় গোতম বৈশালী অভিমুখে চলেছেন। পিছনে অনুগত ভৃত্য ছন্দক।

অনোমা নদীতীরে সূর্যোদয় হল। দুই প্রহর অশ্বচালনা করেও গোতম ক্লান্ত নন। নদীতে স্নান করতে নেমে দেখলেন, জল বয়ে যায়, যায় আবার আসে। তিনি প্রশ্ন করলেন, এর কি আদি নাই? প্রতিধ্বনি বলল, নাই। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এর কি অন্ত নাই? প্রতিধ্বনি আবার বলল, নাই। গোতম আদি অন্তহীন প্রাণের কথা ভাবলেন। কোথা থেকে প্রাণ আসে? কোথায়ই বা যায়?

নদীজল থেকে উঠে এসে গোতম বসনভূষণ ত্যাগ করে গায়ে দিলেন ভিক্ষুর চীবর। তৃষ্ণা বোধ করায় অঞ্জলি ভরে জলপান করলেন। প্রশান্ত বদনে বিদায় দিলেন ছন্দককে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে, ছন্দক মাতা গোতমীকে সিদ্ধার্থের বসনভূষণ দিলে তিনি তা গোপার কাছে পাঠিয়ে দেন। গোপা সেগুলি বিসর্জন দেন পুকুরের জলে। এ বর্ণনার কি তাৎপর্য কে জানে।

গোতম নদীতীরে অনুপ্রিয় গ্রামের আমবাগানে দিন কয়েক নির্জন বাস করলেন। মন বড় চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণও কম চঞ্চল নয়। কেবলই আয়েসের কথা মনে পড়ে। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণার বেগ সহ্য করতে অভ্যাস

করলেন। তন্দ্রা নিদ্রার বেগ সহ্য করতে অভ্যাস করলেন। এবং অভ্যাসে চিত্ত শান্ত হল। তিনি সংসারের অসারতার কথা ভাবলেন, মায়া মোহের অসারতার কথা ভাবলেন। এবং বৈরাগ্যে চিত্ত শান্ত হল।

আমবাগান থেকে বেরিয়ে গোতম বৈশালীর পথ ধরলেন। যে পরমবস্তু লাভের আশায় সংসার ছেড়েছেন তা পাবার উপায় কি? সৎ গুরু।

বৈশালীর নির্গ্রন্থ জৈনদের বিষয়ে অবগত হলেও গোতম মহাবীরের কাছে গেলেন না। গেলেন কালাস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আচার্য আলার কালাসের সন্নিধানে। মহা নিববাণ সূত্রে আছে এক বর্ণনা। আচার্য কালাস ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন। এমনই বাহ্যজ্ঞানশূন্য যে পাঁচশো গরুর গাড়ি তাঁর গা ঘেঁষে চলে গেল, তিনি জানতে পারলেন না।

গোতম আচার্য কালাসের নিকট ধ্যানের প্রক্রিয়া শিখলেন। ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির, নাসিকার দুই রন্ধ্রে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ ও অধোগতি সমান। শীতোষ্ণাদিতে নির্বিকার, হেয় উপাদেয় বুদ্ধিশূন্য। এ সবই তিনি শিখলেন কিন্তু তৃপ্তি এল না। বৈশালী থেকে শ্রাবস্তী গেলেন।

গোতম রামপুত্র উদ্দকের কাছে শিক্ষা সুরু করলেন। উদ্দক বোঝালেন যোগঃ গুণানাং যুক্তিঃ, ঘটনম্ সা এব মায়া। জীব মাত্রই মায়ার বশ। এই বশ্যতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় আত্মজ্ঞান। গোতম আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হলেন। শিষ্যের বুদ্ধির ধার, শিক্ষার আগ্রহ দেখে উদ্দক মুগ্ধ, খুব যত্ন করে গূঢ়বিদ্যা বোঝান। নির্বেদ — বৈরাগ্য — নিরোধ — উপশম — অভিজ্ঞা — নির্বাণ। গোতম সবই বোঝেন কিন্তু স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে আর সংশয় দূর হয় না। কাজেই নির্বেদ বা প্রথম স্তরই অলভ্য থেকে যায়। গোতমের মনে হল এখানে হবে না। তিনি উদ্দকের কাছে বিদায় নিলেন।

গোতম রাজগৃহের পথে ভিক্ষা করছেন। রাজা বিম্বিসারের এই

সুপুরুষ ভিক্ষুকে দেখে মায়া হল, তিনি জমিজমা দিতে চাইলেন। গোতম রাজী হলেন না। সম্পত্তি নয় সদ্গতি চাই।

গোতম গয়ার কাছে একটি পাহাড়ের গুহায় দিন কয়েক রইলেন। ভেবেছিলেন নির্জনে ধ্যান-ধারণা ভাল হবে, কেননা ভক্তিমতী রমনীরা বিরক্ত করতে আসবে না। এখন দেখছেন বাঘ ভাল্লুকে বুঝি ছিঁড়ে খায়। তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন।

নৈরঞ্জনা নদীতীরে উরুবেল গ্রাম। গোতমের পছন্দ হল জায়গাটা। গ্রামের কাছেই এক উপবন, বাঘ ভাল্লুকের উৎপাত নাই। বপ্র, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কোণ্ডিণ্য পাঁচজন ভিক্ষু গোতমের সঙ্গী হন। সকলে ভিক্ষা করেন, সাধনভজন করেন।

ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আঁকড়া। যে যা দেয় তাই গোতম নিয়ে আসেন। এক একদিন ভাত মুখে দিতে পারেন না, তখন মনকে বোঝান, শ্রমণ হওয়া অত সহজ নয়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গোতম তরুতলে একখণ্ড বস্ত্র বিছিয়ে উপবেশন করলেন। চোখের সামনে রন্ধনের অগ্নি প্রায় নির্বাপিত। পোড়া কাঠ দেখে তিনি ভাবছেন। জলে-ভেজা কাঠে আগুন জ্বলে না, কাঁচা কাঠ জলে না। ভিজলেও আগুন জ্বলে না, সর্বপ্রকারে নীরস হলে তবেই সে কাঠে আগুণ জ্বলে।

গোতম এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, রসের শরীরকে শুকনো কাঠ না করলে আগুণ জ্বলবে না। সুরু হল কৃচ্ছ্রসাধন। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

জাতক উপক্রমণিকায় আছে এই রকম বর্ণনা। শ্রমণ গোতম দাঁতে দাঁত চেপে, তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চিত্ত নিরোধের চেষ্টা করেন। এমন পরিশ্রমের কাজ যে তাঁর সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। তিনি শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করলে আহত বায়ু মস্তিষ্কে আঘাত করে, তাঁর খুব যন্ত্রণা হয়, তিনি সহ্য করেন। সারাদিনে তিনি একটি মাত্র চাল খান

শরীর শুকিয়ে শুকনো কাঠ, চোখ কোটরে, পেট ঠেকেছে পিঠে, গায়ের লোম ঝরে যায়। তবু আগুন জ্বলল না।

একদিন গোতম অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ভাবল তিনি মারা গেছেন। সে বার্তা রটে গেল। শুদ্ধোদন গোতমী গোপা মৃত্যু সংবাদ পেলেন। ওঁরা সংবাদদাতাকে জিজ্ঞেস করলেন—তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন ?

—না।

—বুদ্ধত্ব লাভের আগে মারা গিয়েছেন ?

—হাঁ।

গোপা বিশ্বাস করলেন না। অসম্ভব। বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে তিনি মারা যেতে পারেন না।

গোতম জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। মনে পড়ে, কপিলাবস্তু। মনে পড়ে পিতা শুদ্ধোদন ক্ষেতে ধানকাটা তদারকি করছেন। বাতাসে পাকাধানের গন্ধ। তিনি আলপথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে জামগাছতলায় বসলেন। আর রৌদ্র মাখানো অলস বেলায় সহসা তাঁর অন্তর অকারণ পুলকে ভরে গেল।

গোতম ভেবে দেখলেন, অকারণ আনন্দে মন ভরে যাওয়াই ধ্যানের প্রথম অবস্থা নির্বেদ। তিনি কৃচ্ছসাধন ত্যাগ করলেন। পঞ্চভিক্ষু তাঁকে ত্যাগ করল। তা করুক। তিনি মরতে চান না। সুন্দর ভুবনে মানুষের কাছাকাছি বাঁচতে চান। তিনি আবার পেট পুরে খেতে সুরু করলেন। জঠর যন্ত্রণা না থাকায় চিত্তের প্রশান্তি ফিরে এল। স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তুষ্টবান্ তনুভিঃ আত্মবশ্যৈব বিধেয় আত্মা। তিনি ক্রমে ক্রমে ধ্যানের চতুর্থ অবস্থায় পৌঁছলেন। সুখদুঃখের অতীত আনন্দে হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। শুদ্ধ শান্ত সমাহিত। এই অবস্থায় দিনরাত কেটে যায়।

এক ব্রাহ্মমুহূর্তে গোতমের মনে হল, দীর্ঘ ছবছর ধরে তিনি যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন। সত্যধর্ম তিনি দেখেছেন জেনেছেন উপ-

লব্ধি করেছেন। তিনি তথাগত। সেই পথের পথিক। তিনি বুদ্ধ। বোধিজ্ঞানের অধিকারী। তিনি আপ্তকাম। নির্বাণের শান্তি প্রাপ্ত। অনুত্তরং যোগক্ষেমং নিব্বানং অজ্ঝগমং।

[তিন]

—হে আয়ুষ্মান্, আমি জরা দেখে অজর অবস্থার কথা ভাবি, ব্যাধি দেখে অব্যাধি অবস্থার কথা ভাবি, মরণ দেখে অমৃতের কথা ভাবি। তোমরাও এই রূপ ভাববে।

বুদ্ধ সমাগত গ্রামবাসীদের এই রকম উপদেশ দিলে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ বা নিগ্রন্থী শ্রমণ এরকম কথা বলে না। এ কোন মানুষ? তারা বুদ্ধকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেল।

আজ এক পুণ্য দিন। গোপবধূ সুজাতা বনদেবতার কাছে মানত করেছিল। যদি ভাল বিয়ে হয় আর প্রথম সন্তান ছেলে হয় তাহলে পুজো দেবে। জোড়া ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে সুজাতার। দাসীকে বলল—যা বটবৃক্ষতল ঝাঁট দিয়ে আয়।

দাসী বটবৃক্ষতলে বুদ্ধকে দেখে অবাক। দৌড়ে বাড়ি ফিরে সুজাতাকে সংবাদ দিল। বৃক্ষতলে সজীব বনদেবতা।

সুজাতা ভক্তিভরে ফুল দিল দীপ জ্বালাল প্রণাম করল। ভোগের পাত্র সামনে রেখে বলল—প্রভু গ্রহণ করুন।

বুদ্ধ স্মিত হেসে হাতের একটা মুদ্রা করলেন। তারপর ভোগের পরমান্ন আহার করলেন। ভাল লাগল। তিনি আবার ধ্যানস্থ হলেন।

সুজাতা মুগ্ধ নয়নে দেখে। স্থির নিস্পন্দ শরীর, চোখের পাতা পড়ে না। ঠোঁটের কোনে শিশুর হাসি।

ধ্যান ভাঙলে বুদ্ধ চোখ মেলে তাকালেন। অমনি সুজাতার সমস্ত

হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। কিসের এ আনন্দ গোপবধূ জানে না। কোন কোন আনন্দ দুর্জ্ঞেয়।

সুজাতার উঠতে ইচ্ছা করে না, তবু উঠতে হয়। গেরস্থ ঘরের বউ, স্বামী আছে সংসার আছে। দেবতার মুখোমুখি বসে থাকার উপায় নাই। ও বাসন কোসন তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

পরদিন এক প্রহর বেলায় সুজাতা আবার পায়েস নিয়ে এল। বুদ্ধ পায়েসটুকু খেয়ে ধ্যানে বসলেন। সুজাতা প্রণাম করে বাড়ি ফিরল।

এভাবেই, সাধক জীবনে প্রথমা সুজাতার সেবায় বুদ্ধের দিন যায়।

বুদ্ধ একগাছতলা থেকে আর এক গাছতলায় গিয়ে বসেন, এক বন থেকে আর এক বনে যান। কখনও ধীর কখনও দ্রুত পায়চারি করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে চিন্তিত।

মনে পড়ে, গোপাকে কথা দিয়েছিলেন বুদ্ধত্বলাভ করলে বাড়ি ফিরবেন। বুদ্ধত্বলাভ তো হল। এবার? বুদ্ধ মাথা নাড়লেন। নিস্তব্ধ উপবন, উরুবিল্ব গ্রাম, নৈরঞ্জনার তীর, সুজাতার সেবা, নির্বাণের শান্তি। এই তো বেশ। বুদ্ধ তাঁর আসনে স্থির হয়ে বসে ওপর দিকে তাকালেন। হে আকাশ বলে দাও, আমার কর্তব্য কি?

বুদ্ধ গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি যদি ঘরে ফিরে যান, আবার ভোগে লিপ্ত হবেন। তিনি যদি উরুবিল্ব গ্রামে নির্বাণের শান্তিতে জীবন কাটান, জগৎ মহাজ্ঞান জানবে না। সুতরাং আবার বেরোতে হবে। দুঃখ মোচনের উপায় প্রচার করতে হবে দেশে দেশান্তরে। কাকে নির্বাণ ধর্ম বোঝাবেন? কীভাবে বোঝাবেন? এই ধর্ম জটিল, জ্ঞানী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

বুদ্ধ আলার কালাস ও রামপুত্র উদ্দককে স্মরণ করলেন।

সুজাতার আত্মীয়া রাধা মারা গেল। নৈরঞ্জনা নদীতীরে দাহ করা হল রাধাকে, পড়ে রইল ছাই আর কাপড় চোপড়।

বুদ্ধ যা কিছু দেখেন তাই নিয়ে ভাবেন। চিন্তাই সব। গভীর—

ভাবে চিন্তা করলে কত কিছু জানা যায়। রাধার পরিত্যক্ত বাস দেখে তিনি এই রকম চিন্তা করলেন। অন্ন বস্ত্র আবাস ওষধি এবং সঙ্গী অপরিহার্য, শ্রমণও বাদ দিতে পারে না। অন্ন ভিক্ষা করা চলে কিন্তু বস্ত্র চাওয়ার অনেক অসুবিধা। সুতরাং শ্রমণের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্র ব্যবহার করাই বিধেয়। তিনি রাধার পরিত্যক্ত বস্ত্র ছিঁড়ে চীবর বানালেন, নদীতে ভাল করে কাচলেন। শুকোলে সেই চীবর পরিধান করলেন।

পরদিন সুজাতা পায়েস খাওয়াতে এসে বলল—ভগবন্, আপনি রাধার অঙ্গবাস পরিধান করেছেন কেন?

—বস্ত্র সংগ্রহের এর থেকে সহজ উপায় নাই।

—এই বস্ত্র অপবিত্র।

—সংস্কার মুক্ত শ্রমণের পবিত্র অপবিত্র বোধ ভিন্ন প্রকার।

সুজাতার মন মানল না। বলে—ভগবন্, আমি আপনার জন্য চীবর এনেছি।

বুদ্ধ ভেবে দেখলেন, স্বেচ্ছায় বস্ত্র দিলে তা নেওয়া দোষের নয়। তিনি চীবর গ্রহণ করলেন।

সুজাতার সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনও প্রতিবেশীরা বুদ্ধের কাছে আসতে লাগল। সকলে কিন্তু চুপচাপ বুদ্ধের কথা শোনে না, নিজেদের মতামতও ব্যক্ত করে।

জানুস্ সোনি নামে এক ব্যক্তি বলল—নির্জনে থাকা মানুষ-মাত্রেরই ভয়ের। সুতরাং আপনি লোকালয়ে চলুন।

বুদ্ধ উত্তর করলেন—অসম্প্রজ্ঞ অসমাহিত ও বিভ্রান্ত চিত্তের পক্ষে একথা প্রযোজ্য কিন্তু আমার পক্ষে নয়। আমি ভয় ভৈরবকে পরাস্ত করেছি।

শুজাতা মন দিয়ে বুদ্ধের কথা শুনছিল। বলে—আমরা সে কাহিনী শুনতে আগ্রহী।

বুদ্ধ বললেন—অষ্টমী তিথিতে এক বনভূমিতে সারারাত্রি বাস করে-ছিলাম। যদি হরিণ বিচরণ করত, যদি পক্ষী বৃক্ষশাখায় বসত, যদি শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ত, আমার মনে হত ভয়-ভৈরব আসছে। তখন সংকল্প করতাম, যেভাবে ও আসবে সেভাবেই ওকে গ্রহণ করব, যে অবস্থায় ভয়-ভৈরব থাকবে, সে অবস্থায়ই তাকে পরাস্ত করব। যখন পায়চারি করছি তখন ভয়-ভৈরব এলে আমি দাঁড়াতাম না বা বসতাম না বা শুয়ে পড়তাম না। আমি ভয়-ভৈরবকে গ্রাহ্যই করতাম না, তাই ভয়-ভৈরব পরাস্ত হল।

সুজাতা অপলকে বুদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই দৃষ্টি বড় গভীর।

বুদ্ধও সুজাতাকে দেখলেন। এই দৃষ্টি করুণাঘন, কামনার বাষ্পও নাই। তিনি ভয়-ভৈরবের ন্যায় কাম-ভৈরব মারকেও পরাস্ত করেছেন।

আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বুদ্ধ বললেন—আয়ুষ্মতী।

—প্রভু।

—আমি উরুবিল্ব থেকে চলে যাব।

—কেন ভগবন্? আমার সেবায় কী আপনি অপরিতৃপ্ত?

—না। পরিতৃপ্ত।

—তবে?

—আমি আমার গুরুদেবের কাছে যাব। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

—আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী?

—ধর্মপ্রচার। আমার ধর্ম নীতিআশ্রয়ী এবং ক্রিয়া অনুষ্ঠান বিরোধী। কে জানে লোকে এ ধর্ম গ্রহণ করবে কি না।

—করবে। সুজাতা জোর দিয়ে বলে—নিশ্চয় করবে।

বুদ্ধ চিন্তান্বিত। যারা অজ্ঞানে আছে, তারা নির্বাণ-'ধর্ম নেবে না। যারা মনে করে জ্ঞান পেয়েছে তারাও নেবে না। যারা জ্ঞান পেতে

চায় তারা নেবে। বললেন—আচার্য আলার কালাম ও আচার্য রামপুত্র উদ্দকের সন্ধান নিতে পার ?

সুজাতা মাথা হেলিয়ে দিল। পারে।

*

সুজাতার স্বামী লোক পাঠাল আচার্যদ্বয়ের সংবাদ নিতে। একজন গেল বৈশালী, একজন গেল শ্রাবস্তী। সংবাদ ঃ তাঁরা জীবিত নাই।

বুদ্ধ দুঃখিত হলেন। নির্বাণ ধর্মের তত্ত্ব বোঝার মত দুজন মৃত। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে, দেবতারা তাঁকে এ খবর দিয়েছিল। মহাপুরুষের জীবনীকারগণ এভাবে মহিমা বাড়াবার চেষ্টা করেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ সকল মহাপুরুষের বেলাতেই এরকম হয়েছে।

সুজাতা বলল—ভগবন্, আচার্যেরা বেঁচে নাই, সুতরাং আপনি এখানেই থাকুন। আমি কুটির নির্মাণের ব্যবস্থা করি।

বুদ্ধ মৌন রইলেন।

মৌন-সম্মতি পেয়ে সুজাতার স্বামী বর্ষাবাসের উপযুক্ত কুটির নির্মাণ করিয়ে দিলেন। একজন সেবকও নিযুক্ত হল পরিচর্যার জন্য।

বর্ষাবাসের পর বুদ্ধ আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর পূর্বসঙ্গী পঞ্চ ভিক্ষুকে মনে পড়ল। অশ্বজিৎ মেধাবী ও ধৈর্যশীল, সে নির্বাণধর্ম বুঝবে।

আবার সুজাতা লোক পাঠিয়ে সংবাদ নিল। বপ্র, ভদ্রিয়,অশ্বজিৎ মহানাম ও কৌণ্ডিন্য বারাণসীর কাছে ঋষিপত্তনে আছে।

বুদ্ধ আশীর্বাদ করে সুজাতাকে বললেন—আয়ুষ্মতী, নির্বাণ ধর্মলাভে তুমি যে সাহায্য করেছ, তা মনে থাকবে।

সুজাতা চোখের জল মুছে বলল—প্রভু, উরুবিল্বে কবে আসবেন ?

—ধর্ম প্রচারে বেরলে।

—আপনার পথ চেয়ে থাকব আমরা।

বুদ্ধ আর কিছু বললেন না। ধীর পায়ে চলে গেলেন।

* * *

ঋষিপত্তন পৌঁছে বুদ্ধ সাধুসন্ন্যাসীদের মুখে শুনলেন পঞ্চভিক্ষু মৃগদাব বনে থাকে। তিনি সেখানে গেলেন।

ভদ্রিয় বুদ্ধকে দেখে অবাক। শ্রমণ গোতমের কী আশ্চর্য পরিবর্তন। নধর দেহ। সে মহানামকে বলল—শ্রমণ গোতম ভোগ পরায়ণ, ওর সঙ্গে আমরা কথা বলব না।

বুদ্ধ কাছে আসতে ভদ্রিয়ের মনের পরিবর্তন হল, সে অভ্যর্থনা জানাল—আয়ুষ্মন্ গোতম, আসন গ্রহণ কর।

বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তথাগতকে নাম ধরে ডেকো না।

—তুমি তথাগত ?

—হাঁ।

—তুমি সুজাতার পরিচর্যায় তথাগত হয়েছ ?

—তথাগত কোন রমণীর প্রতি আসক্ত নয়। সে ভোগে লিপ্ত হয় নাই।

—তা কি সম্ভব ?

—হে ভিক্ষুগণ, সাধনার দুটি দিক। অনর্থ সংযুক্ত ভোগ এবং অনর্থ সংযুক্ত ত্যাগ! দুই চরমের মাঝখানে এক পথ। মঝ্ঝিম নিকায়। এই পথে অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ।

পঞ্চ ভিক্ষু মন দিয়ে বুদ্ধের উপদেশ শোনে।

—হে ভিক্ষু, সুপ্রচারিত এই নির্বাণ ধর্ম। সকল দুঃখের বিনাশের জন্য এই ধর্ম। এই ধর্মে তোমার মতি অবিচল হোক। তুমি মঝ্ঝিম নিকায়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর। বুদ্ধ নূতন শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন।

মুণ্ডিত মস্তক চীবরধারী ভিক্ষু বুদ্ধকে প্রণাম করল—আমি ধর্মের শরণ নিলাম।

এখন ধর্মই একমাত্র শরণ। কালক্রমে একশরণ তিন শরণে পরিণত হবে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

নবজাত সংঘে ষাটজন দীক্ষিত শিষ্য। বুদ্ধ তাদের উপদেশ দেন—

পঞ্চব্রত পালন কর। জীবহিংসা কোরো না। অদত্ত গ্রহণ কোরো না। অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবা কোরো না। অসত্য বোলো না। মাদক খেয়ো না।

বর্ষার পর শিষ্যরা প্রচারে বেরল, বুদ্ধও মৃগদাবে রইলেন না। তিনি উরুবিল্বের দিকে যাত্রা করলেন।

*

পথে এক ঘটনা।

কতিপয় যুবক বনভোজনে এসেছে। একজন ছাড়া সকলেই সস্ত্রীক। যার স্ত্রী নেই সে এক সুলভ রমণী জুটিয়েছে। যুবক যুবতীরা যখন প্রমোদে গভীর মগ্ন তখন বারবিলাসিনী বিবিধ সামগ্রী নিয়ে গা-ঢাকা দিল। যুবকেরা সারা বন আঁতিপাঁতি খুঁজেও তাকে পেল না। তখন মুখ ঝুলিয়ে পথ হাঁটে।

এক যুবক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করল—হে ভদন্ত, আপনি কি কোন স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছেন?

—না। বুদ্ধ প্রতিপ্রশ্ন করেন—স্ত্রীলোকের খোঁজ করছ কেন?

—এক দুষ্টা রমণী আমাদের জিনিষপত্তর নিয়ে পালিয়েছে।

বুদ্ধ একটু ভাবলেন তারপর বললেন—হে যুবকগণ, দুষ্টা রমণীর সন্ধান করা ভাল, না আত্মসন্ধান করা ভাল?

—আত্মসন্ধান।

—উত্তম কথা। আমি তোমাদের আত্মসন্ধানের পথ দেখাব।

তারা বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করল। কতিপয় যুবক তাঁর সঙ্গ নিল। তিনি সদলে নানাস্থান ঘুরলেন।

উরুবিল্ব গ্রামে বুদ্ধ আবার এসেছেন।

সেই কুটির এমন পরিপাটি যেন তিনি এখানেই থাকেন। সুজাতার নিরলস চেষ্টায় এই পরিপাট্য।

এখন প্রাতঃকাল। বুদ্ধ কুটিরের সামনে উপবিষ্ট।
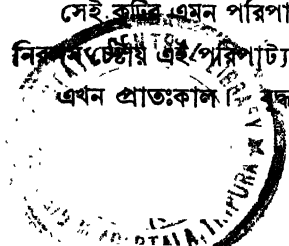
সুজাতা গন্ধপুষ্পের থালি নিবেদন করে প্রণাম করতে বুদ্ধ বললেন
—আয়ুষ্মতী, সব কুশল তো ?

—ভদন্ত, আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই কুশল। আজ আমাদের ঘরে আহারের নিমন্ত্রণ জানাই।

বুদ্ধ মৌন রইলেন। কেউ আহারের নিমন্ত্রণ করলে এভাবেই তিনি সম্মতি জানান। সুজাতা গৃহে ফিরে গেল।

বুদ্ধ শিষ্যদের ধর্ম শিক্ষা দেন।

—হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চব্রত পালনের সঙ্গে তোমরা মানসিক উন্নতির চেষ্টা করবে। প্রগতির চারটি স্তর। প্রথম, স্রোতাপন্ন অবস্থা। এই অবস্থায় অবিনশ্বর আত্মায় স্থির বিশ্বাস আসে। দ্বিতীয়, সকৃদাগামি অবস্থা। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ঘটে। তৃতীয়, অনাগামি অবস্থা। এই অবস্থায় দুঃখ নিবারণের জ্ঞান জন্মায়। অর্হত্ব লাভই নির্বাণ। অর্হৎ অনুভবের আনন্দে মগ্ন থাকেন।

যখন সূর্য মধ্যগগনে, বুদ্ধ আসন ছেড়ে উঠলেন। স্নান করে ধৌত চীবর গায়ে দিলেন। তারপর সশিষ্য সুজাতার বাড়িতে গেলেন ভোজন করতে। তিনি একাহারী, দিনে একবারই খান।

আহারান্তে বুদ্ধ সুজাতা ও অন্যান্য রমণীদের উপদেশ দেন। এই উপদেশ মূলতঃ সংযমের। স্ত্রীলোক কামনাময়ী, ভোগসুখের বাসনাও প্রবল, তাই তাদের আহারে-বিহারে ভোগে-সম্ভোগে সংযমের প্রয়োজন। সংযমে কামিনী হয়ে ওঠে কল্যাণী।

এরপর বুদ্ধ গৃহের পুরুষদের ধর্মাচরণ শিক্ষা দিলেন।

কুটিরে ফিরে এসে দেখেন তিনজন জটাধারী অঙ্গনে উপবিষ্ট। অশ্বজিৎ জানাল, এঁরা তর্ক করতে চান।

জটাধারীদের সঙ্গে বুদ্ধের ধর্ম নিয়ে তর্ক হল অনেকক্ষণ। কোন

মীমাংসা নাই। একজন জটাধারী বলল—হে শ্রমণ, অলৌকিক কিছু দেখাতে পার? বুদ্ধ যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন। জটাধারীরা বলল—শুধু এই? বুদ্ধ যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন। তখন জটাধারীরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তারপর জানতে চাইল, কীভাবে বুদ্ধ করলেন।

বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞার সাহায্যে মনোময় দেহ সৃষ্টি করে আমি জল থেকে লঘু হতে পারি, আগুনে অদাহ্য হতে পারি। যোগবিভূতি এমন কিছু নয়।

উরুবিল্বে তিন মাস কেটে গেল। বুদ্ধ এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে চান না। তিনি অনিকেত। সুজাতা ভোগ নিবেদন করলে বললেন—আয়ুষ্মতী, আমি গয়াশীর্ষ পাহাড়ে কিছুকাল থাকতে চাই।

—ভগবন্, সে বড় নির্জন স্থান।

—তা হোক।

সুজাতা আর কোন আপত্তি তুলল না। তোলা নিরর্থক। যে পুরুষ যৌবনে ঘর ছেড়েছে, স্ত্রী-পুত্র ছেড়েছে, তাকে ধরা যায় না।

বুদ্ধ শিষ্যদের উপদেশ দেন। সুজাতা তন্ময় হয়ে শোনে। সব যে বোঝে তা নয়, শুনতে ভাল লাগে তাই শোনে।

—হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল উপযুক্ত চেষ্টায় আমি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, তোমরাও মুক্তির জন্য অনুরূপ চেষ্টা কর।

—হে ভদন্ত, উপযুক্ত চেষ্টা কি প্রকার?

—উপবাস, অপেক্ষা ও চিন্তাই উপযুক্ত চেষ্টা। উপবাসী থাকতে শেখ। অপেক্ষা করতে শেখ। চিন্তাশীল হতে শেখ।

সুজাতা ভাবে। উপবাস দেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও পরে হয় না। অপেক্ষা করা উপবাস করার চেয়ে শক্ত! ধৈর্য ধরে কত আর অপেক্ষা করা যায়। চিন্তা করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। কি করে উনি নির্বাণের চিন্তা করেন?

গয়াশীর্ষ পাহাড়ে এক গুহার সামনে বুদ্ধ আসন করেছেন। তাঁর দু'পাশে ভিক্ষুরাও আসন করেছে। সকলে নীরব।

ধ্যান ধারণায় সন্ধ্যা উৎরে যায়। রাত্রির অন্ধকার নামে। আর সেই অন্ধকারেই বুদ্ধ দাবানলের দাপট দেখেন। দেখে উপযুক্ত চিন্তা করেন।

পরদিন সকালের ধর্মসভায় বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, সবই জ্বলছে। সবই আদীপ্ত। চক্ষু আদীপ্ত, রূপ আদীপ্ত, রূপ দেখে যে সুখ তাও আদীপ্ত। কিসে আদীপ্ত? আমি চিন্তা করে দেখেছি। রাগাগ্নিতে দ্বেষাগ্নিতে মোহাগ্নিতে আদীপ্ত। রূপের ন্যায় শব্দ গন্ধ রসও আদীপ্ত।

ভিক্ষুরা মুগ্ধ।

বুদ্ধ আবার বললেন—হে ভিক্ষুগণ, রূপ দেখে চোখ। তাই জ্ঞানীর চক্ষুতে নির্বেদ জাত হয়। শব্দ শোনে কান। তাই জ্ঞানীর কানে নির্বেদ জাত হয়। এভাবেই জ্ঞানীর সকল ইন্দ্রিয়ে নির্বেদ জাত হয়।

ভিক্ষুরা স্তব্ধ।

বুদ্ধ আবার বললেন—হে ভিক্ষুগণ, নির্বেদ থেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য থেকে মুক্তি আসে।

ভিক্ষুরা বুদ্ধকে প্রণাম করল।

*

রাজগৃহের উপকণ্ঠে যষ্টিবন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণের সহিত রয়েছেন এখানে। রাজা বিম্বিসার যষ্টিবনে বুদ্ধকে দর্শন করতে এসেছেন। রাজগৃহ থেকে অনেকখানি পথ। তিনি বুদ্ধকে কাছে পাবার জন্য তাঁর প্রমোদ উদ্যান 'বেণুবন' ভিক্ষু সংঘকে দান করলেন। বুদ্ধ যষ্টিবন ছেড়ে বেণুবনে চলে এলেন।

বহু নরনারী বুদ্ধের কাছে আসে, কিছু সংঘেও যোগ দেয়। নালন্দা গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোলিত ও উপতিষ্য বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিলেন। কোলিত গোত্র নামে মৌদগল্যায়ন বলে পরিচিত হলেন। উপতিষ্যের মায়ের নাম রূপসারি, তাই লোকে বলল সারিপুত্র।

মৌদগল্যায়ণ ও সারিপুত্র ধর্মপ্রচারে খুব উৎসাহী। ওঁদের চেষ্টায় বহু শিক্ষিত যুবক বুদ্ধের শিষ্য হল। তারা সংসার ত্যাগ করায় কিছু নারীর মনে বুদ্ধের প্রতি বিরাগ। বুদ্ধের জন্য তারা স্বামী বেঁচে থাকতেও বিধবা। একথা বুদ্ধের কানে যেতে তিনি শিষ্যদের নির্বিকার হতে শিক্ষা দিলেন।

বেণুবনে তিন বছর কেটে গেল। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমত এখন সবার ওপর। ব্রহ্মণ্য ধর্ম ম্লান, জৈন ধর্ম নিস্তেজ। বুদ্ধ খুবই ব্যস্ত।

একদিন প্রাতঃকালীন ধর্মসভায় বুদ্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, দেখলেন তাঁর বাল্যবন্ধু কালুদায়ী খুব মন দিয়ে ধর্মকথা শুনছে। ডাকলেন।

কালুদায়ী রাজগৃহে এসেছে শুদ্ধোদনের কথায়, বুদ্ধকে কপিলাবস্তু নিয়ে যেতে। কিন্তু সেকথা বলল না।

এখন বসন্তকাল। আমের মুকুল ধরেছে। শিরীষ গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছে অজস্র ফুল। কালুদায়ী বাল্যবন্ধুকে বলল—আহা! মধুর বসন্তের কি শোভা। পত্রে পুষ্পে অরণ্যানী ঝলমল করছে। কপিলাবস্তু থেকে রাজগৃহ আসতে যা দেখলাম তা কোনদিন ভুলব না।

—তাই নাকি? বুদ্ধ চতুর হাসলেন—আমি প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে কপিলাবস্তু যাব। কেমন?

কালুদায়ী বোকা নয়, সে বুঝল, বন্ধু মতলব বুঝেছে। আর বুঝেই বাড়ি যেতে রাজী।

*

কপিলাবস্তুর একপ্রান্তে ন্যগ্রোধ-আরাম। এখানে নগরবাসীরা বুদ্ধের বাসের ব্যবস্থা করল। তারপর চলল অভ্যর্থনা। বিপুল ও স্বতঃস্ফূর্ত। ছেলে-মেয়েরা, যুবক-যুবতীরা, রাজপুরুষেরা দলে দলে বুদ্ধকে ফুলের মালা দিচ্ছে, প্রণাম করছে। শাক্যবংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রণাম না করলেও মাথা নোয়াচ্ছে। তাদের গোতম বুদ্ধ ভাষণ দিলেন।

পরদিন ভোরে বুদ্ধ যথারীতি ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। শুদ্ধোদনের বাড়ির মেয়েরা তা দেখে বিস্মিত। এ কোন রীতি রাজসন্ন্যাসীর? শুদ্ধোদনের বড় ছেলে জনসাধারণের কাছে ভিক্ষা চাইছে? এখানে ওসব চলবে না। রাহুলমাতা শ্বশুরকে খবর দিলেন।

শুদ্ধোদন ভর্ৎসনা করলে বুদ্ধ শান্তকণ্ঠে বললেন—যার যা ধর্ম। আপনার ধর্ম ভিক্ষা দেওয়া, আমার ধর্ম ভিক্ষা করা। আপনি মহাগৃহী, আমি মহাভিক্ষু।

পিতা পুত্র একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। পুত্র সরব, পিতা নীরব। মহাজ্ঞানী বুদ্ধের সঙ্গে সামান্যজ্ঞান শুদ্ধোদন তর্ক করলেন না কিন্তু তাঁর মাথায় কথা ঘোরে: আমি পিতা, আমার ধর্ম স্নেহ। তুমি পুত্র, তোমার ধর্ম ভক্তি।

শুদ্ধোদন-ভবনে গৃহস্থ জনোচিত কলরব। অনেক বছর পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে যেমন হবার কথা। বাইরের ঘরে যেখানে বুদ্ধ উপবেশন করেছেন, সেখানে ভিড় জমে যায়। বুদ্ধ-শিষ্যরা তদারকি করে যেন গোতম বুদ্ধের অসুবিধা না ঘটে।

মাতা গোতমী অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন বুদ্ধকে। সঙ্গে গেলেন সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন। সকলে খেতে বসলেন। আয়োজন বহুল হলেও ভিক্ষুরা মিতাহারী। পলান্ন মাংস পিষ্টকাদি সবই খেলেন কিন্তু অল্প পরিমাণ।

ভোজনের পর মাতা গোতমী বললেন—পুত্র, তুমি অভিষ্ট লাভ করেছ?

—করেছি।

--কি সে বস্তু।

—বোধিজ্ঞান।

—এই জ্ঞান কি বলে?

— সব্বথং দুঃখম্। জীবন দুঃখময়। মানুষ জন্মায় মাকে দুঃখ দিয়ে, মরে পুত্রকন্যাকে দুঃখ দিয়ে, বাঁচে দুঃখ পেতে।

—না। মাতা গোতমী ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন—মা ছেলের চাঁদ-মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে যায়। জীবন দুঃখের আবার সুখের।

বুদ্ধ হাসলেন। হেসে বললেন—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ সুখ অসার মনে করে।

মাতা গোতমী বুদ্ধের সঙ্গে তর্ক করলেন না। কিন্তু তাঁর বুকে কথা ঘোরে : স্নেহ মমতা, এই তো সুখের সার।

পুরনারীরা অনেকেই এসেছে বুদ্ধকে দেখতে কিন্তু রাহুলমাতা চুপচাপ বসে আছেন। তিনি যাবেন না। যদি তাঁর কোন দাম থাকে তাহলে বুদ্ধই তাঁর কাছে আসবেন।

সখী ললিতা বলল—রাহুলমাতা কি ভাবছ ?

—আমার ভাগ্যের কথা।

—তুমি সৌভাগ্যবতী। কুমার রাজার রাজা হয়ে এসেছেন।

—তাই তাঁর এত অহঙ্কার।

— ভগবান্ বুদ্ধের কোন অহঙ্কার নাই।

—দেখা যাক।

রাহুলমাতা অভিমানে মুখ ঝুলিয়ে দিলেন। বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়ে। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—আমি তাঁর ধর্মপত্নী, তাঁর সন্তানের মা। তিনি ভগবান্ হয়েছেন বলে স্বামীত্ব পিতৃত্ব খসে যায় নাই।

স্ত্রীর খেদোক্তি বুদ্ধ অবগত হলেন। হয়ে চিন্তামগ্ন। গৃহত্যাগের সময় বলেছিলেন, মহাজ্ঞান লাভের পর ঘরে ফিরবেন, নির্বাণের শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন জীবন। তা হল না। ধর্মপ্রচার শিষ্য সংগ্রহ, এই তাঁর কাজ। তাই বলে রাহুল ও রাহুলমাতাকে অবহেলা ? মৃদু অথচ স্থির কণ্ঠে বললেন—আমি রাহুল জননীর সন্নিধানে যাব। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নও আমার সঙ্গে যাবে।

গ্রৈষ্মিক ভবন। অমল ধবল পাথরের মেঝেয় পা ফেলে বুদ্ধ চলেছেন। তূর্যবাদিনী নারীগণ সেবাপরায়ণ ভৃত্যগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

নির্দিষ্ট কক্ষের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মুণ্ডিতমস্তক কাষায়-বস্ত্রে আবৃত শরীর শান্ত মুখশ্রী। তাঁর বামে সারিপুত্র ডাইনে মৌদ্‌গল্যায়ন।

রাহুলমাতা পতি বিরহে বড়ই কাতর ছিলেন। তাই স্বামী সন্দর্শনে আত্মঅসম্বৃতা। শ্বশুর ও শিষ্যদের সামনেই বুদ্ধের দু'পা জড়িয়ে ধরলেন। বুদ্ধ বাধা দিলেন না। কিছুক্ষণ পর রাহুলমাতা উঠলেন। দুচোখ জলে ভেসে যায়।

শুদ্ধোদন বললেন—পুত্র, যেদিন তুমি গৃহত্যাগ কর সেদিন থেকে রাহুলমাতা সন্ন্যাসিনী। দিনে একবার খায়, মেঝেয় শোয়। আমোদ আহ্লাদ করে না।

বুদ্ধ বললেন—রাহুলমাতা উপযুক্ত আচরণই করেন।

রাহুলমাতা অশ্রুসংবরণ করেছেন। কাঁদবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, এখন কিছু কাজের কথা বলে নেওয়া ভাল। তা নাহলে হয়ত এ জীবনে বলাই হবে না। বললেন—আর্যপুত্র, আপনি বোধিজ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন এ অতি আনন্দের কথা। আশা করি, এবার গৃহেই থাকবেন আপনি।

বুদ্ধ কেঁপে উঠলেন। যা ভেবেছিলেন তাই।

বললেন—আয়ুষ্মতী, আমার সেরূপ ইচ্ছাই ছিল।

—এখন নাই?

—না। আমি গৃহী হলে নির্বাণধর্মের প্রচার করবে কে?

রাহুলমাতা কয়েক পলক ভাবলেন, তারপর মিনতির গলায় বললেন —ভদন্ত,আমিও নির্বাণধর্ম প্রচার করব। আমাকে ভিক্ষুণী করে সঙ্গে নিন।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের দিকে তাকালেন। দৃষ্টিতে মিনতি। বুদ্ধ মাথা নাড়লেন। তা হয় না।

বললেন—হে রাহুলমাতা, তুমি চিত্তকে শান্ত কর। আমি তোমাকে জ্ঞান দেব। অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ জ্ঞান। প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোকে তোমার চিত্ত শান্ত হবে।

রাহুলমাতা তন্ময় হয়ে শুনলেন কিন্তু চিত্ত শান্ত হল না। বুক-ভরা হাহাকার। বললেন—ভদন্ত, আমি আপনাকে শুধু চোখের দেখা দেখতে চাই। শিষ্যা সুজাতার মত আপনার সেবা করতে চাই। তাহলেই চিত্ত শান্ত হবে আমার।

বুদ্ধ আবার মাথা নাড়লেন। তা হয় না।

বললেন—হে রাহুলমাতা, তুমি মৈত্রীভাবনা সাধবে, মৈত্রীভাবনায় বিদ্বেষবুদ্ধি দূর হয়। তুমি করুণাভাবনা সাধবে, করুণাভাবনায় হিংসাবুদ্ধি দূর হয়, তুমি মুদিতভাবনা সাধবে, মুদিতভাবনায় অরতি ভাব দূর হয়। তুমি উপেক্ষাভাবনা সাধবে, উপেক্ষা ভাবনায় কাম দূর হয়। বিদ্বেষ বুদ্ধি, হিংসাবুদ্ধি, অরতিভাব ও কাম দূর হলে চিত্ত শান্ত হয়।

রাহুলমাতা বললেন—হে ভদন্ত, আমি ধর্মের শরণ নিতে চাই। আমাকে দীক্ষা দিন।

বুদ্ধকে ঈষৎ বিচলিত দেখায় কিন্তু শিষ্যদের সামনে গুরুর বিচলিত হওয়া শোভা পায় না। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আয়ুষ্মতী, সঙ্ঘে ভিক্ষুণীদের থাকা নিষিদ্ধ।

রাহুলমাতা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হায়, কিছুই করার নাই।

* * *

রাহুল দীক্ষা নিল।

রাহুলের পরিধানে চীবর, হাতে ভিক্ষাপাত্র কিন্তু মুখে শ্রমণোচিত প্রশান্তি নাই, কেননা বালকেরও চিত্ত অশান্ত। বুঝতে পেরে দীক্ষাগুরু সারিপুত্র বললেন—হে রাহুল, চিত্তের প্রশান্তির জন্য তথাগত পাঁচটি উপায় নির্দেশ করেছেন। এক, প্রাণে কুশল চিন্তা আনবে। দুই, পাপের বিষময় ফল চিন্তা করবে। তিন, মনকে পাপচিন্তা থেকে পুণ্য-চিন্তায় চালনা করবে। চার, অভ্যাসের দ্বারা মনকে নিবৃত্ত করবে। পাঁচ, দাঁতে দাঁত টিপে তালুতে জিভ চেপে মনকে নিগ্রহ করবে। তাহলে চিত্ত শান্ত হবে।

রাহুল বুদ্ধকে প্রণাম করলেন। তারপর সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে।

গ্রামে ও নগরে গৃহস্থ স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করে। সংসারী মাত্রেরই আছে রকমারি সমস্যা। বিচক্ষণ সংসারী সমস্যার মোকাবিলা করে, অন্যেরা পালাবার পথ খোঁজে। যঃ পলায়তি স জীবতি।

প্রবাদ বাক্যটি সুন্দর হলেও অসম্পূর্ণ। পালিয়ে গিয়ে যদি নিরাপদ স্থানে ঠাঁই পাওয়া যায় তবেই জীবতি, না হলে মরতি। এমন নিরাপদ ঠাঁই বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘ। পলায়নকারীরা সংঘে প্রবেশ করে।

সুন্দরনয়ন এমন এক পলায়ণকারী। ওর সমস্যা ব্যভিচারিণী স্ত্রী। দুর্বলচিত্ত নয়ন স্ত্রীকে বশে আনতে পারে না, তাই সংসারবৈরাগ্য এসে গেছে। ও সংঘের শরণ নিল। বুদ্ধ বললেন—স্ত্রীলোক যেন নদী অথবা পথ অথবা পান্থশালা। কে যে কখন কিরূপ ব্যবহার করে তার ঠিক নাই। স্ত্রীর ব্যাভিচার নিয়ে মন খারাপ কোরোনা। নির্বাণের সাধনা কর।

সুন্দরনয়ন তাই করে।

—হে ভিক্ষুগণ, যখন আমি বুদ্ধত্বলাভ করি নাই, যখন আমি কেবল বোধিসত্ব ছিলাম, তখন আমার প্রাণে নানাপ্রকার ভাব আসত। আমি সে সবকে দুভাগে ভাগ করতাম। কামভাব এলে কামকে একদিকে রাখতাম, নৈষ্কাম্যকে অপরদিকে রাখতাম। তারপর বিচার করতাম। কাম নিজের অকল্যাণকর অপরের অকল্যাণকর। কাম প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, নির্বাণলাভে বাধা দেয়।

কপিলাবস্তু নগরীতে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার পুরোদমে চলছে। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন দীক্ষাদানে মহাউৎসাহী। বুদ্ধের উৎসাহও কম নয়।

*

বুদ্ধ নন্দকে (গোতমী পুত্র) দীক্ষা দেবেন ঠিক করেছেন কিন্তু নন্দ ভিক্ষু হতে নিরুৎসাহ। কারণ আছে।

নন্দ একটি তরুণীকে ভালবাসে। মনে প্রাণে। নন্দর মনে হয়, জনপদকল্যাণীকে না পেলে বেঁচে থাকাই বৃথা।

বিয়ের আয়োজন মোটামুটি সম্পূর্ণ। কল্যাণীর জন্য বিবিধ অলঙ্কার ও রেশমজাত বস্ত্র কেনা হয়েছে, নিমন্ত্রণ পত্র লেখা হয়েছে, শালিধান ও মেষ সংগ্রহ হয়েছে। এবার বিয়েটা হলেই হয়।

এ খবর বুদ্ধের কানে গেল। তিনি চিন্তা করলেন। নন্দ যা করতে যাচ্ছে তা ওর পক্ষে অকল্যাণকর। ওকে নিবৃত্ত করা দরকার। যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রেমিককে বোঝান যাবে? যার হৃদয় জুড়ে কল্যাণী তার কানে কী আমার কথা ঢুকবে?

বুদ্ধ বিচক্ষণ, কৌশলের আশ্রয় নিলেন।

নন্দ কল্যাণীর কাছে চলেছে, বুদ্ধ আহ্বান করলেন—নন্দ, সাত-সকালে কোথায় চলেছ?

নন্দর এমন সৎসাহস নাই যে বলে, ভালবাসার মেয়ের কাছে যাচ্ছি। বলল—কোথাও না।

বুদ্ধ সবই বুঝলেন। বুঝে বললেন—আমার সঙ্গে আসার আপত্তি আছে?

নন্দ ক্ষীণকণ্ঠে বলল—না।

—উত্তম কথা। বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্রটি নন্দের হাতে দিলেন—এটি তুমি রাখ।

নন্দ লক্ষণের ফল ধরে রইল।

বুদ্ধ ন্যগ্রোধ—আরামের দিকে যাত্রা করলেন। সোজাপথে নয় ঘুরপথে, যে পথে পড়ে কল্যাণীর বাড়ি। পিছনে ভিক্ষাপাত্র হাতে নন্দ।

বাতায়ণ দিয়ে এ দৃশ্য দেখে কল্যাণীর বুক ফেটে যায়। পাগলিনী-প্রায় বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ব্যাকুল কণ্ঠে নন্দকে বলল—আর্যপুত্র, কোথা যান?

বুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে নন্দর চোখে চোখ রাখলেন। নন্দ কল্যাণীকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। নীরবে বুদ্ধের অনুসরণ করে।

কল্যাণী উদ্গত অশ্রু চেপে বারংবার বলল—আর্যপুত্র, যাবেন না।

নন্দ নিষেধ শুনতে পেয়েও গেল। বুদ্ধের ইচ্ছায়ই ইচ্ছা।

নন্দর খেয়ে সুখ নাই, শুয়ে শান্তি নাই। মাথা কামালে আর চীবর গায়ে দিলেই ভালবাসার মেয়েকে ভোলা যায় না। নন্দ দিন দিন শুকিয়ে যায়। কণ্ঠার হাড় প্রকট, চোখের কোলে কালি।

বুদ্ধ স্থির বুঝলেন, রূপজ মোহ অতি প্রবল। তা ভাঙ্গতে মুদ্গর দরকার।

বুদ্ধ নন্দকে বনের গভীরে নিয়ে গেলেন। সেখানে শবর কন্যারা কাষ্ঠ আহরণে ব্যস্ত। একটি কন্যার বর্ণ গৌর, দেহ সুঠাম, মুখশ্রী অনিন্দ্য। পদ্ম যেমন পাঁকে জন্মায় তেমন এই পদ্মাবতী জন্মেছে শবরকুলে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধ নিজের ঋদ্ধিবলে এক অনিন্দ্য মুখশ্রী সুঠাম দেহী কন্যা সৃষ্টি করে নন্দকে দেখালেন। দেখ, কাকে বলে রূপবতী রমণী।

নন্দর দেখে আশা মেটে না।

বুদ্ধ বললেন—নন্দ, কল্যাণী কী এই কন্যার চেয়েও সুন্দরী ?

—না। নন্দ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে—এই রূপসীর তুলনায় কল্যাণী নেহাৎই বানরী।

—উত্তম কথা। বুদ্ধ স্মিত হাসলেন—যদি তুমি আমার কথামত চল এই কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।

নন্দ বুদ্ধের কথামত চলে। উপবাস দেয়, ধ্যানে বসে, মনকে নিগ্রহ করে।

বুদ্ধ ভিক্ষুদের বললেন—দেখ, নন্দ রূপসী যুবতী লাভের আশায় কী সাধনাই করছে।

তখন ভিক্ষুরা নন্দকে উপহাস করে। সাধু তোমার চেষ্টা, সাধু তোমার বিচার। নন্দ বদলে গেল।

বুদ্ধ বললেন—নন্দ ভাঙ্গাছাত ঘরের মত ছিল, কামনা-জল পড়ত। এখন কিন্তু পাকা ছাত।

নন্দ ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করল। বুদ্ধ নন্দ ও আরও কয়েকজন শাক্য তরুণকে নিয়ে কপিলাবস্তু ত্যাগ করলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন দেবদত্ত, আনন্দ ও রাহুল।

*

শ্রাবস্তী নগরীর উপকণ্ঠে জেতবন, পুষ্পতরু ও ফলবান বৃক্ষ সমৃদ্ধ রমণীয় উদ্যান। সকল ঋতুতেই জেতবনে পুষ্পশোভা। বুদ্ধ বড় ফুল ভালবাসেন। তাই জেতবনের বিস্তৃত পুষ্পবিতানে তাঁর জন্য নির্মিত হয়েছে গন্ধকুটি।

বুদ্ধ তাঁর কক্ষে একাকী রয়েছেন। পাশের কামরায় পরিচারক ভিক্ষু। বুদ্ধ খুব ভোরে উঠলে পরিচারক হাত মুখ ধোয়ার জল এনে দিল। হাতমুখ ধুয়ে তিনি চীবর গায়ে দিলেন, তারপর ধ্যানে বসলেন। পরিচারক পাহারায় রইল, যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে। এক প্রহর গত হলে বুদ্ধ উঠলেন, বহির্বাস পরলেন, ভিক্ষায় বেরলেন। আজ তিনি একা।

এক শ্রেষ্ঠীর ভবনদ্বারে বুদ্ধ নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই তাঁর ভিক্ষাপ্রার্থনার পদ্ধতি। শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ধর্মপ্রাণা। ও বুদ্ধকে মুগ্ধচোখে দেখছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধ অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। প্রশস্ত ললাট, যুগ্ম ভুরু, আয়ত চক্ষু, সুবিন্যস্ত দন্তরাজি, কুঞ্চিত কেশ বাম হতে দক্ষিণে ঢেউ তোলা। বৃষস্কন্ধ কবাটবক্ষ এবং আজানুলম্বিত বাহু। দীর্ঘকায় গৌরকান্তি সুঠাম শরীরে বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ।

শ্রেষ্ঠী পত্নী ভিক্ষাপাত্র ভরে দিল।

*

শ্রেষ্ঠী পত্নীর নাম বিশাখা, শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা। বিবাহের পর শ্রেষ্ঠী পুণ্যবর্ধনের পত্নী, শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্রবধূ।

কিছুদিন আগের ঘটনা।

শ্রেষ্ঠী মিগারের বাড়িতে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছে। মিগার তখন খেতে বসেছেন, তিনি ভিক্ষুকে দেখেও দেখলেন না। বিশাখা ভিক্ষুকে বলল—আপনি অন্য বাড়িতে যান। আমার শ্বশুর এখন বাসি ভাত খাচ্ছেন, ভিক্ষা দিতে পারবেন না।

বাসি ভাত বলায় মিগারের রাগ হল, বিশাখাকে বললেন—বেরিয়ে যাও। তখন বিশাখা জবাব করল—বেরিয়ে যেতে বললেই আমি বেরিয়ে যাব না। মধ্যস্থদের ডেকে আমার বিচার হোক। যদি দোষী সাব্যস্ত হই, তাহলেই বেরিয়ে যাব।

মধ্যস্থরা এলে বিশাখা বলল—শ্বশুরমশাই ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিলেন না। আমার রাগ হয়েছিল। তাই বলে আমি শ্বশুরমশাইকে অসম্মান করার জন্য বাসিভাতের কথা বলিনি।

মধ্যস্থ প্রশ্ন করলেন—বাসিভাতের কী কোন নিহিত অর্থ আছে?

—আছে। বিশাখা মৃদু হাসলেন—ভাত হল সুকৃতি। শ্বশুর-মশাই বিগত জন্মে সুকৃতি করেছেন, তাই বললাম বাসিভাত খাচ্ছেন। যদি ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিয়ে এ জন্মে সুকৃতি করতেন, তাহলে বলতাম গরম ভাত খাচ্ছেন।

মধ্যস্থরা রায় দিলেন, বিশাখা নির্দোষ।

মিগার ক্ষমা চাইলে বিশাখার চোখ ফেটে জল এল। বলে—আমি আর এ বাড়িতে থাকব না।

মিগার অনুনয় করলে বিশাখা শান্ত হল।

বুদ্ধ অনুরাগিনী বিশাখা মিগার ও পুণ্যবর্ধনকে নিয়ে চলেছেন জেতবন। বুদ্ধের ভাষণ শুনে মিগার জৈনধর্ম ত্যাগ করলেন। বিশাখা মহাসুখী।

*

জেতবনে এক অভাবনীয় দৃশ্য। সমস্ত উদ্যানভূমি স্বর্ণমুদ্রায় আচ্ছাদিত। কার এই স্বর্ণমুদ্রা? শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের। কেন এই স্বর্ণমুদ্রা? জেতবন কেনা হবে।

ব্যাপারটা এইরকম।

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ইচ্ছা হয়েছে, জেতবন ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করবেন। এই প্রস্তাব জেতবনের মালিক কুমার জেতের কাছে রাখতে তিনি হাসলেন—শ্রেষ্ঠী মূল্য দিতে পারবেন ?

—কত দিতে হবে !

—সমস্ত উদ্যানভূমি ঢাকতে যত স্বর্ণমুদ্রা লাগে তত।

– উত্তম।

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের সেবা করতে পেরে মহাসুখী। এখন আর তাঁর কোন দুঃখ নাই।

*

বিশাখা তন্ময় হয়ে ভাবছে। ত্যাগেই সুখ, প্রয়োজন হলে ও অনাথপিণ্ডদের মত সর্বস্ব উজাড় করে দেবে বুদ্ধকে।

বছর না ঘুরতে প্রয়োজন দেখা দিল।

শ্রাবস্তীতে দুর্ভিক্ষের হাহাকার। অন্ন দাও। অন্ন দাও। বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করলেন—হে পুরবাসীজন, তোমরা সকলে দিলে এ পাত্র অক্ষয় হবে। ভিক্ষা অন্নে শ্রাবস্তীকে বাঁচাব।

বিশাখা অকাতরে দান করল। শ্রাবস্তী বাঁচল।

পুণ্যবর্ধন ও বিশাখা শিলাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধকে প্রণাম করল। তিনি বললেন, হে আয়ুষ্মান, হে আয়ুষ্মতী, তোমাদের আশীর্বাদ করি।

বিশাখা গভীর গলায় বলল—হে ভদন্ত, আমাদের সংঘে আশ্রয় দিন। আমরা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতে চাই।

বুদ্ধ চিন্তায় পড়লেন। শুধু বিশাখা নয়, অনেক তরুণীই আশ্রয় চায়। ভিক্ষুণী সংঘ গড়া কী ভাল হবে ?

বললেন—হে আয়ুষ্মতী, প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করেও তুমি ভিক্ষুণী। কারণ তোমার প্রাণে করুণা ভাবনা। গৃহেই থাক। পঞ্চশীল, পঞ্চনিমিত্ত অনুশীলন কর।

বুদ্ধ অনুরাগিণী বহুক্ষণ তদ্গতচিত্তে উপদেশ শুনল। শাস্ত্রে আছে,

বিশাখা ঘরে থেকেও বুদ্ধের খুব বড় সহায়। ওর দানের তুলনা হয় না। বুদ্ধের জীবনে অনন্যা।

বিশাখার মাথায় বহুমূল্য সোনার সিঁথি। অলঙ্কার পরে ও বুদ্ধ সন্নিধানে যাবে না। তাই বাইরের ঘরে ভিক্ষু আনন্দের কাছে সিঁথি রেখে গেল। বাড়ি ফেরার সময় ও ভুলে গেল সিঁথির কথা। যাবেই। যে ধর্মের কথা ভাবে সে গয়নার কথা মনে রাখে না।

আবার যখন বিশাখা জেতবনে এল, আনন্দ সেই সিঁথি দিতে গেল বিশাখাকে। বিশাখা নেবে না। যা সংঘে রেখে গেছে তা সংঘেই থাকবে। বলল—আনন্দ, ওটা বিক্রী করে দাও। যা পাবে তা ধর্মের জন্য খরচ কর।

উত্তম প্রস্তাব। ধর্ম প্রচারে বহু অর্থের প্রয়োজন। দেশে বিদেশে সংঘারাম ও বিহার নির্মিত হচ্ছে। ভিক্ষুর সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং খদ্দেরের খোঁজ পড়ে।

খদ্দের মেলে না। এ অলঙ্কার কে কিনবে? কার এত উদ্বৃত্ত অর্থ আছে? শেষমেষ বিশাখাই উপযুক্ত অর্থ দিয়ে সিঁথি কিনে নিল।

সেই অর্থে বুদ্ধের জন্য নির্মিত হল অতি অপরূপ "পূর্বারাম" বিহার।

এভাবেই বুদ্ধের সাধক জীবনে দ্বিতীয়া বিশাখার আনুকূল্য।

বিশাখার গৃহে বুদ্ধের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। কতিপয় ভিক্ষুও সঙ্গে যাবে।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পর বুদ্ধ ভিক্ষুদের স্নান করতে বললেন। ভিক্ষুরা তাদের একমাত্র চীবর খুলে নগ্নশরীর ধারাস্নান করে। এই দৃশ্য বিশাখার দাসী আহার্য প্রস্তুত সংবাদ দিতে এসে দেখে গেল।

ভিক্ষুদের ভোজন শেষ হলে বিশাখা বুদ্ধকে বলল—ভদন্ত, অনুমতি করুন আমি সংঘের সকল ভিক্ষুকে দুই প্রস্থ চীবর দান করি।

বিশাখে! বুদ্ধ স্মিত হাসলেন—তোমার এ অনুমতি প্রার্থনা কেন?

—ভদন্ত, নগ্নতা অশুচি ও বিরক্তিকর। দুই প্রস্থ চীবর থাকলে ভিক্ষুদের স্নানের সময় নগ্নদেহ হতে হবে না।

বুদ্ধ মৌন রইলেন। জৈনশ্রমণেরা নগ্নদেহে যত্রতত্র বিচরণ করে। মহাবীর নগ্ন থাকার পক্ষপাতী, কিন্তু তিনি নন। নগ্নদেহ যথার্থই বিরক্তিকর।

বিশাখা মৌন সম্মতি পেয়ে কর্মচারীকে উপযুক্ত আদেশ দিল।

সংঘের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা বসেছে। প্রধান ভিক্ষুদের সঙ্গে বিশাখাও উপস্থিত।

সারিপুত্র বলল—ভদন্ত, সংঘে প্রবেশ করেছে নানা অনাচারী। দেনদার, ক্রীতদাস, পলাতক বন্দী।

বুদ্ধ সারিপুত্রকে বললেন—এদের সংঘে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল।

বিশাখা বলল—ভদন্ত, বহু বালক সংঘে প্রবেশ করেছে। এরা সারাদিন খাই খাই করে।

বুদ্ধ কুড়ি বছরের কম বালকদের সংঘে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন।

উপালি বলল—বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত, উন্মার্গগামী সংঘে প্রবেশ করলে লোকে নিন্দা করে।

এদেরও সংঘে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল।

ভিক্ষুদের আচরণ বিষয়ে বুদ্ধ কিছু নির্দেশ দিলেন।

বিশাখা বলল—ভদন্ত, সংঘে নারীগণের প্রবেশের ব্যবস্থা হোক। আমি নিজের জন্য একথা বলছি না। এমন অনেক ধর্মপ্রাণা মহিলা রয়েছেন, যাঁরা তথাগতের ধর্ম ও নিয়ম পালন করতে আগ্রহী ও সক্ষম।

বুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত তুললেন—জানি। ভিক্ষুণী-সংঘ গঠন করা কঠিন কাজ। আমাকে চিন্তা করতে দাও।

বিশাখা আর কিছু বলল না।

[চার]

শ্রাবস্তী, বৈশালী, কৌশাম্বী, রাজগৃহ। নগর থেকে নগরে বুদ্ধ তাঁর ধর্মদেসনা প্রচার করছেন। এবং করছেন দীর্ঘকাল। তাঁর খ্যাতি ব্রাহ্মণদের ঈর্ষার কারণ। ঈর্ষা চরিত্র হননের পথ খোঁজে। এবং সে পথ নারী। সাধক জীবনে নারীর এই এক ভূমিকা।

চল্লিশোর্ধ বুদ্ধ জেতবনের সভায় ধর্ম উপদেশ দেবার পর বললেন—প্রাচীনপন্থীরা আমার, সংঘের ও ধর্মের বিরোধিতা করছে। কিন্তু আমি যে পথ দেখিয়েছি, তা প্রাচীন পথ। শুধু সংস্কার করেছি।......মনে কর, গভীর অরণ্যে এক প্রাচীন পথ লুপ্তপ্রায়। তুমি সেই পথে চলেছ। দেখতে পেলে এক প্রাসাদ। তখন রাজাকে খবর পাঠালে। রাজা সেই প্রাসাদের সংস্কার করলেন।...আমি প্রাচীন পথ ধরে চলি, প্রাসাদতুল্য জ্ঞান দেখি এবং নিজেই তার সংস্কার করি। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। মুক্তপুরুষ সম্বন্ধে আমি একই কথা বলি।

—না। এক ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়ালেন—আপনি বেদ ও ব্রাহ্মণ বিরোধী। আপনি ঈশ্বরে আস্থাহীন।

বুদ্ধ উত্তর দিতে উদ্যত, এক যুবতী পাগলিনী প্রায় সভায় প্রবেশ করল। যুবতী স্ফীতোদর এবং আসন্ন সন্তানসম্ভবা। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী যুবতীকে নজর করছে। ও কান্নার গলায় বলল—বুদ্ধ, তুমি তো মুক্তপুরুষ কিন্তু আমাকে যে বন্ধনে ফেলেছ তার কী হবে?

ব্রাহ্মণ চীৎকার করল—কী হবে চিঞ্চার?

বুদ্ধ নরম চোখে চিঞ্চার দিকে তাকালেন—তোমার কী হয়েছে?

—এই। চিঞ্চা গর্ভবতী উদরের ওপর হাত রাখল—যে ঘরে তোমার সঙ্গে শুয়েছি, সে ঘরে তো আর প্রসব করা চলে না। কতদিন

থেকে বলছি ঘর ঠিক কর, তা তুমি কথা কানে তুলছ না। এদিকে আমার এখনই হয় অবস্থা। আমি কোথায় যাব?

ব্রাহ্মণ চীৎকার করল—কোথায় যাবে চিঞ্চা?

সভা নিস্তব্ধ। গাছের পাতা পড়লে শোনা যায়। বুদ্ধ শান্ত গলায় বললেন—চিঞ্চা ভগিনীকে কোথাও যেতে হবে না। সে এখানেই মুক্ত হবে।

চিঞ্চা বেশ অভিনয় করছিল। বুদ্ধের কথায় রেগে গিয়ে সব গোলমাল করে ফেলল। ও উত্তেজিতভাবে বড় বেশী হাত তোলে, ফলে পেটে বাঁধা কাঠের হাঁড়ি পড়ে গেল ঠকাস করে।

—এখন কী হবে? চিঞ্চা ব্রাহ্মণের দিকে তাকায় আর কাঁদে।

করুণাঘন বুদ্ধের চিঞ্চার জন্য কষ্ট হয়। কী লজ্জা! কী অপমান! হতভাগিনী কুচক্রী ব্রাহ্মণের কথায় গর্ভবতী সেজেছিল।

*

কৌশাম্বীতে বহু নরনারী শুনছে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী। ব্রাহ্মণ কুমারী মাগন্দিয়াও শুনছে। শুনতে শুনতে ও বুদ্ধের প্রেমে পড়ল।

পরদিন মাগন্দিয়া মনোহারিনী সাজে এল, পরিধানে এমন সূক্ষ্মবস্ত্র যে যৌবনসামগ্রী সবই দেখা যায়। আর প্রসাধনে গৌরতনু আরও গৌর, রক্তিম অধরোষ্ঠ আরও রক্তিম। রূপবতী মাগন্দিয়ার দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

বুদ্ধ ভুলেও তাকাচ্ছেন না।

মাগন্দিয়া মনে মনে ছটফট করে। এই সৌম্যকান্তি শ্রমণ আমার বাঞ্ছিত পুরুষ। আমি গোতম বুদ্ধকে ভোলাবই।

বুদ্ধ নির্বিকার। ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

—হে ভিক্ষুগণ, আমি যখন গার্হস্থ্য অবস্থাতে ছিলাম তখনই বুঝতে পারি ভোগ সুখের অসারতা। আমার বিশ্বাস জন্মে ভোগসুখের অতীত আনন্দঘন পরম অবস্থার। জানতে পারি, উপযুক্ত ধ্যান করলে এই অবস্থায় থাকা যায়। উপযুক্ত ধ্যানের চারিটি অবস্থা। এক, কাম

ত্যাগ করে প্রীতিসুখপূর্ণ ধ্যান। দুই, বিতর্ক ও বিচার অতিক্রম করে একাগ্রচিত্ত ধ্যান। তিন, প্রীতির অতীত হয়ে উপেক্ষাভাবে ধ্যান। চার, সুখ দুঃখের অতীত পরিশুদ্ধ ধ্যান।

মাগন্দিয়ার ভাল লাগে না, তবু মন দিয়ে শোনে। শোনার ভান করে। আহা, এমন রূপবান্ পুরুষ! পেলে জীবন সার্থক। পেতেই হবে।

রাত বাড়ে। ধর্মকথা শেষ হয়, ভক্তেরাও বাড়ি ফেরে কিন্তু মাগন্দিয়ার ওঠার নাম নাই। যখন বুদ্ধ একাকী, মাগন্দিয়া প্রেম নিবেদন করল। বুদ্ধ বললেন, তিনি কামের অতীত।

পরদিন মাগন্দিয়া পিতাকে নিয়ে এল। পিতা বুদ্ধের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে বুদ্ধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

মাগন্দিয়া আহত সর্পিনীর ন্যায় গর্জন করে। যে রূপলাবণ্য স্বয়ং কৌশাম্বীরাজ কামনা করেন, তা এই শ্রমণ অবহেলা করল। ঠিক আছে, এর উচিত ব্যবস্থা হবে।

কিছুদিন পর মাগন্দিয়ার যথার্থই বিয়ে হল কৌশাম্বীরাজ উদয়নের সঙ্গে। এখন মাগন্দিয়া রাজক্ষমতার অধিকারিনী।

রাণী মাগন্দিয়ার আদেশে রাজভৃত্যগণ বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বিবিধ প্রকারে নির্যাতন করে। অনার্য ভাষায় গালি দেয়, বুদ্ধের নামে কুৎসা রটায়, ভিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা করে।

ভিক্ষু আনন্দের আর সহ্য হয় না। বুদ্ধকে বলে—ভদন্ত, অনুমতি করুন আমরা কৌশাম্বী ত্যাগ করি।

—না আনন্দ, তা হয় না। অপমান ও কুৎসাকে গুরুত্ব দেওয়া অন্যায়। আরও এক কথা। কৌশাম্বী ত্যাগ করে অন্য কোন নগরে গেলাম আমরা, যদি সেখানেও রাজপুরুষগণ আমাদের বিরক্ত করে?

—তাহলে সে নগরও পরিত্যাগ করব।

—যে নগরে যাব সেখানেও যদি বিরক্ত করে?

—সে নগর থেকেও চলে যাব।

বুদ্ধ মৃদু হাসলেন—আনন্দ, বিরক্তি নিবৃত্তির কোন উপায় নয় স্থান পরিবর্তন। উপায়, নির্বিকার থাকা।

বুদ্ধ কৌশাম্বীতে থেকে মাগন্দিয়ার শত নির্যাতন সহ্য করেন। তিনি অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবেন। হায়! প্রত্যাখ্যাতা রমণীর ক্রোধ তিনি জয় করতে পারলেন না।

মাগন্দিয়া বুদ্ধকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উদয়নের মন বিষিয়ে দিল। গোতম বুদ্ধ কৌশাম্বী ত্যাগ করলেন।

*

শ্রাবস্তী পৌঁছে বুদ্ধ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

বিশাখা এল। কেমন যেন মনমরা, কাজে উৎসাহ নাই। চোখ ছল ছল করে। বুদ্ধ বললেন—কী হয়েছে?

—অকাল মৃত্যু। মেয়েটি আমার কন্যার মতনই ছিল। তার স্মৃতি ফিরে ফিরে মনে আসে। কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

—বিশাখে, তোমার মুখে এ কথা! তুমি শুধু নিজের ভাবনা ভাববে?

—নিজের ভাবনা যে আপনি আসে।

—ভাবো তো শ্রাবস্তীতে আজ কত বালিকা মারা গেল। কত মারা গেল পৃথিবীতে। বহু। বহুর দুঃখ ভাবলে একের দুঃখ অকিঞ্চিৎকর। নয় কী?

বিশাখার অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়।

*

বর্ষাবাসের সময় সংঘে নানা অশান্তি, কারণ এই ঋতুতে ভিক্ষুরা সংঘেই সবসময় থাকে, ফলে ঝগড়া, বিবাদ। বুদ্ধ অভিজ্ঞ ভিক্ষু উপালির সঙ্গে আলোচনা করেন। বিশাখা আলোচনায় যোগ দিল।

আনন্দ সংবাদ আনে, এক পরিব্রাজিকা বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে চায়। বুদ্ধ বিশাখাকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি এখন নিয়ম প্রবর্তনে ব্যস্ত।

বিশাখা আলোচনা সভা থেকে উঠে এল।

পরিব্রাজিকা বলল—আমার নাম সুন্দরী। আমি বুদ্ধের সেবা করতে চাই।

বিশাখা দেখল পরিব্রাজিকা তরুণী, ভাবলক্ষণও সুবিধার নয়। বলল—সংঘে নারীর থাকার ব্যবস্থা নাই।

—জানি। আমি সংঘের কাজকর্ম করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যাব।

—তুমি পরিব্রাজিকা, তোমার আবার বাড়ি কী?

—শ্রেষ্ঠী মহাভাগ পরিব্রাজিকাদের জন্য বিহার নির্মাণ করেছেন। আমি সেখানেই থাকি।

বিশাখা বলল—উত্তম। তুমি গন্ধকুটি পরিমার্জনা করবে।

সুন্দরী খুব ভোরে জেতবন আসে, গন্ধপুষ্প চয়ন করে, কুটি পরিমার্জনা করে। সেবায় কোন ত্রুটি নাই। ধর্মসভায় গোলমাল করে না, মন দিয়ে উপদেশ শোনে। ব্যবহারে কোন ত্রুটি নাই।

আজ সুন্দরী এক ভক্তকে বলল—বুদ্ধ আমার পরিচর্যায় খুব তুষ্ট।

সাধারণ মানুষের মেয়েমানুষের ব্যাপারে বড় কৌতূহল। সে আগ্রহের গলায় বলে—খুব তুষ্ট মানে কী?

সুন্দরী সলজ্জ হাসল—সে আপনি বুঝে নিন।

—আহা! তুমিই বল।

—সে আমি বলতে পারব না।

—না। তোমাকে বলতেই হবে।

—বুদ্ধ আমাকে গ্রহণ করেছেন।

বলে সুন্দরী চলে যায়।

ভক্ত সুন্দরীর কথা বিশ্বাসও করল না, অবিশ্বাসও করল না। এমন হলে যা হয়। একে বলে—তোমার কী মনে হয়? ওকে বলে—তোমার বিশ্বাস হয়? এভাবেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আর কিছু লোকের বিশ্বাসও হয়।

তখন এক ঘটনা। পরিব্রাজিকা সুন্দরী নিখোঁজ।

কুচক্রীরা ভক্তদের মধ্যে প্রচার করে—বুদ্ধশিষ্যরা গুরুর কলঙ্ক চাপা দেওয়ার জন্য সুন্দরীকে খুন করেছে।

ভক্তরা বিশ্বাস করে না। এই তো সেদিন চিঞ্চাকে নিয়ে কী কাণ্ড হয়ে গেল। সব মিথ্যা।

—মিথ্যা? কুচক্রী গলাবাজি করে—দেখতে চাও মৃতদেহ?

—হাঁ, চাই। বলল বুদ্ধভক্ত।

—তাহলে এস আমার সঙ্গে। কুচক্রী ভক্তকে জেতবনের দক্ষিণ উপান্তে নিয়ে গেল।

মাটি, বালি ও ঝরাপাতার স্তূপ খোঁড়াখুঁড়ি করতেই বেরিয়ে পড়ল সুন্দরীর মৃতদেহ। দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই, গলায় কালশিটে, আঙুলের দাগও রয়েছে।

কে সুন্দরীকে গলা টিপে মেরেছে? পুরবাসীজন নগর-কোটালের কাছে গেল। নিভৃতে বিচক্ষণ নাগরিক বলল—গোপন তদন্ত করলে হত্যাকারীকে ধরা যাবে। এ ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণদের চক্রান্ত।

—বুঝলাম। কাকে সন্দেহ করেন?

—যজ্ঞেশ্বর, রুদ্রনারায়ণ ও তাদের আজ্ঞাবহ ব্যক্তি।

—হত্যার উদ্দেশ্য?

—বুদ্ধের নামে অপবাদ প্রচার। নারী-আসক্তির চেয়ে বড় অপবাদ কোন সাধকের নামে দেওয়া যায় না।

—সাধক জীবনে নারীর স্থান নাই?

—আছে। সে নারী কামিনী নয়, কল্যাণী। যেমন বিশাখা।

কোটাল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর গুপ্তচর যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে এখন মেলামেশা করে যেন অন্তরঙ্গ সখা।

সখা বলল—যজ্ঞেশ্বর, তোমার কথা ঠিক। দীর্ঘদিনের অভ্যাস কেউ ছাড়তে পারে না। বুদ্ধ দশ বছর স্ত্রীসহবাস করেছে, কৃচ্ছ্র-সাধনেও তেমন বিশ্বাসী নয়। ওর মুক্তি নাই, শাস্তি সুনিশ্চিত। শোনা যাচ্ছে, দুএকদিনের মধ্যেই রাজপুরুষেরা বুদ্ধকে বন্দী করবে।

—তাই না কি ?

—হাঁ।

কী আনন্দ সংবাদ। যজ্ঞেশ্বর সখার বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে :

চল, কিঞ্চিৎ সুরাপান করা যাক।

শৌণ্ডিকালয়ে যজ্ঞেশ্বর প্রচুর মদ খেল। সখা মদ খাওয়ার ভাণ করল। গুপ্তচর ভালই ভাণ করতে পারে।

যজ্ঞেশ্বর বিভোল মাতাল। হিতাহিত জ্ঞান নাই। সখার কাছে নিজের পাপ নিজেই প্রকাশ করে।

জহ্লাদের খড়্গে যগেশ্বরের প্রাণ গেল।

বুদ্ধ সবই শুনলেন। শোনার পর এক অসাধারণ বিচার করলেন। দেশে ব্রাহ্মণদের নির্বাণধর্মে আগ্রহী করতে পারছেন না, তাই বিরোধিতা। তিনি এখন থেকে বিদেশে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করবেন।

বিশাখা সদাই মুক্তহস্ত। ভিক্ষুদের পাথেয়ের অভাব হল না; তারা দূরদেশে গেল ধর্মপ্রচারে।

—হে ভিক্ষুগণ! এই ধর্মের সার কথা, মধ্যপথে বিচরণ কর। মধ্যপথ কী ? এই পথ কাম সুখের নয়, নিগ্রহ দুঃখেরও নয়। তথাগত দুই চরম পথ ছাড়া মধ্যপথের জ্ঞান লাভ করেছেন। এই পথে জ্ঞান, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিকের পথের গঠন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

তোমরা জনগণকে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলবে।

বুদ্ধ রাজগৃহের সন্নিকট গৃধ্রকূট পাহাড়ে ভিক্ষুদের উপদেশ দিচ্ছেন। বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন উদাহরণ দিয়ে। এক প্রহর গত হলে ভিক্ষুরা উঠল।

বুদ্ধ একাকী চিন্তা করছেন। গভীর চিন্তাই সমাধি, এই অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

বিকেল হয়। দর্শনার্থীরা গন্ধপুষ্প নিবেদন করল। তিনি তাদের সঙ্গে দুচার কথা বলে স্নানে গেলেন। পরিচারক ভিক্ষু তাঁর কক্ষ পরিষ্কার করে দিল।

সন্ধ্যায় বুদ্ধ আবার ভিক্ষুদের উপদেশ দিচ্ছেন।

—হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের আর্যসত্য এইপ্রকার। জন্মে দুঃখ, জরায় দুঃখ, ব্যধিতে দুঃখ, মরণে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগে দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিয়োগে দুঃখ, যা পেতে চাই তা না পেলে দুঃখ। দুঃখ নিরোধের পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসাবাদ করে, তিনি উত্তর দেন।

বুদ্ধের পদতলে আলোকিত রাজগৃহ নগরী। ধীরে ধীরে দীপ নিভে যায়। অন্ধকার বাড়ে।

বুদ্ধ ধ্যানে বসলেন।

রাজগৃহে থাকে এক দীন হীন অনাথা। একাকিনী পুণ্যদাসীর স্বামী পুত্র কেউ নাই। খাটবার বয়স গেছে তবু পুণ্যদাসীকে খাটতে হয়। গৃহস্থের বাড়িতে গোসেবা, ধান সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া এইসব কাজ করে পেট চালায়।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হলে পুণ্যদাসীর মন কেমন করে। জীবন তো যায়, পরকালের কাজ কিছুই করা হল না। মৃত্যুর পর যমদূত কত যন্ত্রণা দেবে কে জানে।

সহসা পুণ্যদাসী দেখতে পেল গৃধ্রকূট পাহাড়ের মাথায় দীপশিখা। আলোমাত্রই মানুষের মনে সাহস সঞ্চার করে। পুণ্যদাসীর মনে হল, ভয় নাই—বুদ্ধের শরণ নিলে ভয় নাই।

পুণ্যদাসীর বড়ই ইচ্ছা ভগবান্ বুদ্ধকে ভিক্ষা দেবে। বীজের যেমন অঙ্কুরিত হবার ইচ্ছা, পক্ষীশাবকের যেমন উড়বার ইচ্ছা, তেমনি সহজ এই ইচ্ছা। তবু সহজ নয়। পুণ্যদাসী ভাবে, কী দেবে? কী আছে ওর? অনেক ভেবে ও এক বস্তু আঁচলে বাঁধল।

পুণ্যদাসী জানে কোনপথে কোন সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষায় যান। ও ঠিক পথের ধারে অপেক্ষা করে।

বুদ্ধ চলেছেন। তাঁর চলার ছন্দ বড় সাবলীল, কোন জড়তা নাই। পুণ্যদাসী তাঁর চরণে প্রণাম করল, তারপর আঁচলের গেরো খুলতে গিয়েও খুলতে পারে না। মনে বড় দ্বিধা।

বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করলেন।

—এই নাও প্রভূ। পুণ্যদাসী গেরো খুলল।

অনাথার চোখের জলে বুঝি পোড়ারুটি ভিজে যায়। বুদ্ধ ঈষৎ ব্যগ্রভাবেই দান গ্রহণ করলেন। তারপর আবার চলেছেন।

পুণ্যদাসীর একবার মনে হল, ভগবান্ তথাগতের কাছে সব সমান, ঘিয়ে ভাজাই বা কী আর আগুনে পোড়াই বা কী। আবার মনে হল, রাজ-বাড়ি থেকে রোজ যাঁর কাছে ভোগ আসে তিনি পোড়ারুটি খাবেন কেন?

সংশয়ের দুঃসহ দোলায় পুণ্যদাসী বিপর্যস্ত। গৃহস্থ বাড়িতে কাজে গেল না। দেখবে, বুদ্ধ পোড়ারুটি কী করেন।

মধ্যাহ্নে বৃক্ষতলে বুদ্ধ ভোজনে বসলেন। ভিক্ষু আনন্দ আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। যেমন আদেশ হবে প্রভুর তেমন আহার্য পরিবেশন করবে। আহার্যের অভাব নাই।

বুদ্ধ বললেন—আনন্দ, চীবর প্রসারিত কর।

—আহার্য?

—আহার্য আমার ভিক্ষাপাত্রেই আছে।

বুদ্ধ প্রসন্নমনে পোড়ারুটি খেয়ে জল পান করলেন। রাজভোগ স্পর্শও করলেন না।

পুণ্যদাসী অন্তরাল হতে সবই দেখল। দেখে কৃতার্থ। যে পুণ্য আজ সে করল, তার ক্ষয় নাই।

সংঘে পোড়ারুটি খাওয়া নিয়ে আলোচনা হতে বুদ্ধ মৃদু হাসলেন: দাতা অনুসারে দানের মূল্য।

সাধকের বাঞ্ছিতা মনোহারিণী নয়, অনুরাগিণী।

অসাধারণ এক দাতা বারাণসীর সুপ্রিয়া।

তখন বর্ষাঋতু। ভিক্ষু বির্কণের মাংস খেতে ইচ্ছা। সুপ্রিয়া বুদ্ধদর্শনে সংঘে এলে বলল—আমার জন্য কিঞ্চিৎ মাংসের যূষ পাঠাতে পার?

—পারি। সুপ্রিয়া না ভেবেই মাথা হেলিয়ে দিল।

বাড়ি এসে সুপ্রিয়া স্বামীর এক ছাত্রকে বাজারে পাঠাল মাংস কিনতে। সেদিন বৃষ্টির বিরাম ছিল না, দোকান সব বন্ধ। ছাত্র খালি হাতে ফিরে এল।

সুপ্রিয়া গালে হাত দিল। এখন উপায়? কথা দিয়ে কথা রাখবে না?

সুপ্রিয়া বঁটি দিয়ে নিজের উরু থেকে খানিকটা মাংস কেটে যূষ রাঁধল। তারপর দাসীকে বলল—যা, ভিক্ষু বির্কণকে দিয়ে আয়। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলিস, অসুস্থ।

সুপ্রিয়া বিছানায় শুয়ে আছে। স্বামী এলে বলল সব কথা। স্বামী রাগ করলেন না, প্রশংসাই করলেন।

বুদ্ধ রাগ করলেন। বির্কণকে বললেন—ভিক্ষু, মাংস খেয়েছ?

—হাঁ ভদন্ত।

—কিসের মাংস জান?

—না।

—অপদার্থ, নরমাংস খেয়েছ।

বির্কণ অধোবদন দাঁড়িয়ে থাকে। বুদ্ধ তাকে সুপ্রিয়ার অসাধারণ দানের কথা বললেন। তারপর নিয়ম করলেন, কিসের মাংস না জেনে কোন ভিক্ষুর মাংস খাওয়া চলবে না।

—হে ভিক্ষুগণ, নবাগতদের এই নিয়মগুলি বলবে: অদত্ত কোনও

দ্রব্য নেবে না। ইচ্ছা করে প্রাণীহত্যা করবে না। অলৌকিক শক্তি নিয়ে অহঙ্কার করবে না। সকলপ্রকার এমনকি তির্যকযোণির সঙ্গে মৈথুন করবে না।

বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুদের আহার্যে লোভ, পরিধেয়ে বিচার, আবাসে অসন্তুষ্টি ইত্যাদি অভিযোগ আসে, তাই উপদেশ দিচ্ছেন।

—হে ভিক্ষুগণ, উপসম্পদার সময় বলবে: ভিক্ষুকে যাবজ্জীবন ভিক্ষান্নের ওপর নির্ভর করতে হবে। ভিক্ষুকে যাবজ্জীবন শ্মশান থেকে পাওয়া পরিধেয়ের ওপর নির্ভর করতে হবে। ভিক্ষুকে যাবজ্জীবন আবাসের জন্য তরুতলের ওপর নির্ভর করতে হবে। ভিক্ষুকে যাবজ্জীবন গোমূত্র বনজ ওষধি ইত্যাদি ভেষজের ওপর নির্ভর করতে হবে।

প্রব্রজ্যার্থীদের ন্যায় শ্রমণদের জন্যও বুদ্ধ কতিপয় নিয়ম করলেন। মিথ্যাবাদ, মদ্যাদি পান, অকালভোজন, নৃত্যগীত ও রঙ্গদর্শন নিষিদ্ধ হল।

বুদ্ধ-সংঘে সারিপুত্রকে তাঁর পরেই স্থান দিলেন। আনন্দকে স্থায়ী পরিচারক রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর বয়স বাড়ছে। সবদিক সামলাতে পারছেন না।

রাজগৃহে যষ্টিবন, শ্রাবস্তীতে জেতবন আর বৈশালীতে মহাবন। বুদ্ধ মহাবনে রয়েছেন। তিনি ভাবছেন কৃশাগোতমীর কথা।

শ্রাবস্তীতে থাকাকালীন এক ঘটনা। পুত্র শোকাতুর কৃশাগোতমী বুদ্ধের চরণে ভেঙ্গে পড়ল—ভদন্ত, কৃপা করো। আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে দাও।

বুদ্ধ চিন্তা করে বললেন—আয়ুষ্মতী, যে গৃহে মৃত্যুর ছায়া পড়েনি সেগৃহ থেকে এনে দিতে পার একমুষ্টি সর্ষপ?

পুত্রশোকাতুরা নারী বুদ্ধের কথার নিহিত অর্থ না বুঝে দরজায় দরজায় ঘুরল। হায়! এমন বাড়ি নাই। সুতরাং বাড়ি ফিরে গেল।

সেই কৃশাগোতমী আবার এসেছে।

বুদ্ধ বললেন—আনন্দ কৃশাগোতমী কেমন আছে?

—ভাল।

—তাহলে এসেছে কেন ?

—কৃশাগোতমী আপনার শরণ নিয়েছে। সংঘের শরণ চায়। বিতাড়িত করব কী ?

বুদ্ধ নিরুত্তর। নারীর স্থান গৃহে, কিন্তু কৃশাগোতমীর গৃহ নাই। সে ধর্মনিয়ম পালন করতে সক্ষম। এখন নারী নির্গ্রন্থ সমাজে স্থান পায়। কী করা উচিত ?

বললেন—এখনই বিতাড়িত করার প্রয়োজন নাই। আমাকে চিন্তা করতে দাও।

বুদ্ধ চিন্তা করছেন, আনন্দ সংবাদ দিল, একদল শাক্যনারী মহাবনে এসেছে। আপনার দর্শন চায়।

বুদ্ধ ঈষৎ বিচলিত। শাক্যনারী ? কে জানে, তাদের মধ্যে হয়ত রাহুল-মাতা রয়েছে।

বললেন—শাক্যনারীদের কে নিয়ে এল এখানে ?

—মহাপ্রজাবতী গোতমী।

—রাহুলমাতাও এসেছেন ?

—না।

বুদ্ধ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মহাপ্রজাবতী গোতমী মাতৃতুল্য। মাতা কন্যা ভগিণীকে শ্রমণের ভয় নাই। ভয় জায়াকে।

বললেন—মহাপ্রজাবতী এখানে বিশ্রাম করুন, ধর্মউপদেশ শ্রবণ করুন তারপর কপিলাবস্তু ফিরে যান।

—ভদন্ত, মহাপ্রজাবতী সংঘে প্রবেশ করবার অনুমতি প্রার্থিনী। তিনি চীবর পরিহিতা ছিন্নকেশা। এতখানি পথ পায়ে হেঁটে এসেছেন। পা ফুলে গেছে। মহাপ্রজাবতীর ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

—অসম্ভব।

—ভদন্ত, স্ত্রীলোক কী ভিক্ষুণী হবার যোগ্য নয় ?

—যোগ্য।

—তবে? মহাপ্রজাবতী আপনার মাতৃতুল্যা। স্তন্যদান করেছেন, লালন পালন করেছেন। আপনার তাঁকে সংঘে থাকতে দেওয়া উচিত।

বুদ্ধ নিরুত্তর। এরপর যদি গোপা সংঘে থাকতে চায়?

অনেকক্ষণ পর বললেন—আনন্দ, সারিপুত্রকে ডাক। ভিক্ষুণী সংঘের নিয়মাবলী গঠন করতে হবে।

আনন্দ সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নিল।

*

বুদ্ধ জেতবনে ফিরে এলেন। ক্লান্ত। এখন তিনি এখানেই থাকবেন কিছুকাল।

সারিপুত্র উপালি ও বিশাখাকে নিয়ে বুদ্ধ আলোচনা করছেন। দুই সংঘ বিপজ্জনক, একে অপরের বিরোধিতা করবে। তারপর নরনারীর ব্যাপার। ভিক্ষুণীদের কঠোর অনুশাসনে থাকতে হবে।

বুদ্ধ বললেন—ভিক্ষুণীদের আটটি প্রধান ধর্ম পালন করতে হবে। ভিক্ষুণীরা বয়ঃকনিষ্ঠ ভিক্ষুকেও অভিবাদন করবে। দেখাশোনা করার লোক না থাকলে ভিক্ষুণী সংঘে বর্ষাবাস করতে পারবে না। ভিক্ষুণী-দের ভিক্ষুসংঘে এসে ধর্মোপদেশ নিতে হবে। বর্ষাবাসের পর ভিক্ষুণীদের সংঘের কাছে অভিজ্ঞতা অকপটে ব্যক্ত করতে হবে। ভিক্ষুণী গুরু দোষে দোষী হলে উভয় সংঘের কাছে শাস্তি পাবে। দু'বছর শিক্ষানবিশী করার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের কাছে উপ-সম্পদার অনুমতি চাইতে হবে। ভিক্ষুণী কোন কারণেই ভিক্ষুর প্রতি কটুভাষা ব্যবহার করতে পারবে না। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের শাসন বচন বলতে পারবে না কিন্তু ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের শাসন বচন বলতে পারবে।

আনন্দের নারীর প্রতি বিশেষ মমতা। নিয়ামাবলী ভিক্ষুণীদের পক্ষে বড়ই কঠোর। তবু চুপ করে রইল। পরে শোধন হবে।

মহাপ্রজাবতী ভিক্ষুণী সংঘের নেত্রী হলেন। তিনি আশা করে-ছিলেন গোপা সংঘে আশ্রয় নেবে, কিন্তু এল না।

যে শাক্যনারীরা মহাপ্রজাবতীর কাছে এল, তাদের একজন রূপনন্দা। ও ভিক্ষুণী হলেও বুদ্ধের ধর্মসভায় বিশেষ আসে না। প্রথম কারণ, ভিক্ষুণীদের সংঘে উপযুক্ত স্থান দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, বুদ্ধ বড় বেশী নারীর রূপের অসারতার কথা বলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে, বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে এমন অপরূপা মায়াসুন্দরী সৃষ্টি করলেন যার কাছে রূপনন্দার রূপ অকিঞ্চিৎকর। তারপর তিনি রূপ-নন্দার চোখের সামনে মায়াসুন্দরীকে যুবতী, মধ্যবয়স্কা ও বৃদ্ধায় রূপান্তরিত করলেন। রূপের পরিণতি দেখে রূপনন্দার সব অভিমান ঘুচে গেল।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ নারীর কামিনীরূপের চেয়ে কল্যাণীরূপের প্রাধান্য দিলেন।

মহাপ্রজাবতী আনন্দকে দিয়ে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানালেন, বয়ঃকনিষ্ঠ ভিক্ষুরা বয়োজ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণীদের প্রতি সম্মান দেখাক।

বুদ্ধ রাজী হলেন না। বললেন—আনন্দ, সংঘে যদি নারীর স্থান না হত তাহলে ধর্ম চিরস্থায়ী হত। এখন মনে হয় সংধর্ম পাঁচ শত বৎসর স্থায়ী হবে। যদি নিয়মে শিথিলতা আসে, তাহলে এত বৎসরও স্থায়ী হবে না।

জেতবনে বুদ্ধের বিশ বছর কাটল।

*

সংঘের জন্য বুদ্ধ বিষণ্ণ।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। মাগন্দিয়ার জ্বালাতনের পর আর এক জ্বালাতন।

কৌশাম্বীর ভিক্ষু-সংঘে শৌচাগারে জল ফেলা নিয়ে বিবাদ বাধে। বিবাদের পর দলাদলি। ঝগড়া বাড়ে। পরাক্রান্ত দল অপর পক্ষের এক ভিক্ষুকে সংঘ থেকে বিতাড়িত করল। সেই ভিক্ষু বুদ্ধকে জানায় তার প্রতি অবিচার হয়েছে, সে জল ফেলেনি।

বুদ্ধ কৌশাম্বী গেলেন। তাঁর সামনে বিবাদমান দুই দল চুপ করে থাকে। তিনি সরে গেলেই ঝগড়া। উত্যক্ত হয়ে বুদ্ধ সংঘ ত্যাগ করেন।

পারিলেয্যক গ্রামের এক অরণ্য। বিশাল বিশাল তরু। সুনিবিড় ছায়া। বুদ্ধ অরণ্যে কুটির বাঁধলেন। শাস্ত্রে আছে, একটি বুনো হাতী তাঁকে জল এনে দেয়, কুটির পাহারা দেয়, ভিক্ষায় বেরোলে তাঁর পেছনে যায়। বুদ্ধ মহাশান্তিতে আছেন।

এদিকে সংঘের অবস্থা শোচনীয়। বুদ্ধ চলে গেছেন শুনে গৃহীরা বন্ধ করল ভিক্ষা দেওয়া। সুতরাং দুই দল ঝগড়া মিটিয়ে ফেলল। তখন আনন্দ পারিলেয্যক গিয়ে বুদ্ধকে ফিরিয়ে আনল সংঘে। অভিজ্ঞ উপালি সভা ডাকল। সারিপুত্র, অনাথ পিণ্ডদ, মহাপ্রজাবতী ও বিশাখাকে বুদ্ধ পরিতাপের গলায় বললেন—সংঘ গড়ে আমি ভুল করেছি। ধর্মের চেয়ে সংঘ বড় হয়ে উঠছে। এ আমি চাই নাই।

সভাসদগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কারণ, বুদ্ধের অভিযোগ সত্য।

আজ আবার সভা বসেছে। এই সভা বিশাখা আহূত।

বিষণ্ন বুদ্ধ বললেন—বিশাখে, কী নিয়ে বিবাদ?

—ভদন্ত, এক যুবতী ভিক্ষুণীর শরীরে গর্ভবতীর লক্ষণ। তাকে সংঘ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

—ভিক্ষুণীর বক্তব্য কী?

—ও বলছে, ঘরে থাকতেই গর্ভসঞ্চার হয়েছিল, বুঝতে পারে নি। সংঘে ব্যভিচারের ফলে গর্ভসঞ্চার হয় নাই।

—বিশাখে, তুমি অন্তরালে ভিক্ষুণীকে পরীক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ কর।

বিশাখা পরীক্ষা করল। মাসের হিসাবে ভিক্ষুণীর কথাই ঠিক। বুদ্ধকে জানালে তিনি গর্ভবতী ভিক্ষুণীর ভার বিশাখাকে দিলেন।

যথাসময়ে ভিক্ষুণীর ছেলে হল।

মাস শেষ না হতেই আবার এক ঘটনা যা বুদ্ধের বিষণ্ণতা বাড়ায়।

ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা ভিক্ষায় বেরিয়েছে, এক যুবা ওর কুটিরে ঢুকে খাটের তলায় লুকোল। উৎপলবর্ণা জানতে পারে না।

যুবতী ফিরে এসে খাটে বসেছে, যুবা বেরিয়ে এল। ভিক্ষুণী কাঁদে—তোমার পায়ে পড়ি, আমার সর্বনাশ কোরো না।

যুবা বড়ই কামার্ত, শুনল না। উৎপলবর্ণাকে বলাৎকার করে চলে গেল। মহাপ্রজাবতী আনন্দকে দিয়ে বুদ্ধকে সংবাদ দিলেন।

বুদ্ধ রাজার কাছে গেলেন। নগরের মধ্যে ভিক্ষুণী বিহার নির্মাণ করতে হবে। জেতবনে যুবতীদের নিরাপত্তা কোথায়?

ভিক্ষুণীদের নিয়ে বুদ্ধের নানা সমস্যা।

*

সাধারণ মানুষ দূরের কথা, বুদ্ধভক্ত ভিক্ষুরাই কাম জয় করতে পারে না। নারীর রূপযৌবন দেখলে সব উপদেশ ভুলে যায়। কে যেন ভুলিয়ে দেয়।

রাজগৃহে এক ভিক্ষু শ্রীমতীকে দেখে অস্থির। রূপবতী গণিকা। ভিক্ষুকে সব উপদেশ ভুলিয়ে দিল। সে সংঘারামে ছটফট করে।

এ সংবাদ বুদ্ধ পেলেন। পেয়ে ভাবছেন। কী করা যায়?

অকস্মাৎ শ্রীমতী মারা গেল। বুদ্ধ বললেন, হয়েছে।

বুদ্ধের কথায় বিম্বিসার শ্রীমতীর সৎকার বন্ধ রাখলেন। সাতদিন পর সশিষ্য বুদ্ধ গেলেন শ্রীমতীকে দেখতে। রাজাও গেলেন।

বুদ্ধ রাজার দিকে তাকালেন—গণিকার এক রাতের দক্ষিণা কত?

—পঞ্চাশ মুদ্রা।

—এখন কত?

—এক কপর্দকও না।

বুদ্ধ কাম-মোহিত ভিক্ষুর দিকে তাকালেন—বিনা ব্যয়ে গণিকাকে ভোগ করতে পার। করবে?

ভিক্ষু শিউরে উঠল।

বুদ্ধ প্রায়ই ভিক্ষুদের শ্মশানে নিয়ে যান। মৃতদেহ দেখে যদি নারী দেহের প্রতি আসক্তি ঘোচে ভিক্ষুদের।

*

যৌবনকালে গণিকা আম্রপালী বহু রাজা ও শ্রেষ্ঠীর নজর কেড়েছিল। সুতরাং বিপুল ধনরাশির অধিকারিণী। সে আজ কোটি গ্রামে এসেছে বুদ্ধ দর্শনে।

আম্রপালী ভক্তিভরে বুদ্ধকে প্রণাম করল। জীবনে যত পুরুষ দেখেছে, সবাই কামার্ত। নারীভুকদের চোখ লালসায় চকচক করে। এই পুরুষের করুণাময় দৃষ্টিতে করুণা ঝরে পড়ছে। এঁর সেবায় জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বিলিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না।

বলে—ভদন্ত, অনুগ্রহ করে আমার গৃহে অন্নগ্রহণ করলে ধন্য হব।

—কবে?

—যদি অনুমতি করেন, আজই।

বুদ্ধ চিন্তায় পড়লেন। লিচ্ছবিদেরও নিমন্ত্রণ করার কথা কিন্তু এখনও করেনি। তিনি আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

খুশী মনে আম্রপালী আপন শিবিকায় উঠে বসল। শতাধিক ভিক্ষু নিয়ে বুদ্ধ কয়েক ঘণ্টা পরে আসছেন। উপযুক্ত আহার্যের আয়োজন করতে হবে। সহচরীকে বলল—বাহকদের ত্বরা দাও।

কারুকার্যময় শিবিকা রাজপথে দ্রুতগতি চলেছে। এ শিবিকা সকলেই চেনে। লিচ্ছবিপ্রধান শিবিকা থামাবার চেষ্টা করল কিন্তু শিবিকা থামল না। অগত্যা প্রধান শিবিকা অনুসরণ করে।

ঘরে পৌঁছুলে প্রধান বলল—আম্রপালি, আজ তুমি বুদ্ধের ভোজনের আয়োজন কোরো না।

—কেন?

—আজ আমার ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার কথা। আমি কোটিগ্রাম যাবার আগেই তুমি সেখানে উপস্থিত।

—হাঁ। আমি নিমন্ত্রণ করে এলাম। সশিষ্য তথাগত আসছেন। আমি আহার্যের আয়োজন করছি।

—আমার আয়োজন কিন্তু সম্পূর্ণ।

—তা কী হয়েছে?

—প্রচুর অপব্যয় হবে।

—সে আর কত। আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি... নিয়ে যান।

প্রধান দিশাহারা। যখন দিশা ফিরে পেল, বলে—আমওয়ালি, তুমি কী পাগল হয়েছ?

—হাঁ।

আম্রপালী কুলকুল করে হাসে।

প্রধান বুঝতে পারে না। এ কোন হাসি? গণিকার না সাধিকার? কোন কোন হাসি বড় রহস্যময়।

আম্রপালী দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুণী হল। ভিক্ষুণীর ধনরাশিতে কিবা প্রয়োজন? বুদ্ধকে সর্ব্বস্ব দান করে আম্রপালী সংঘে থাকে।

কোন ভিক্ষুণীর আচরণে ত্রুটি দেখলে বুদ্ধ বলেন—আম্রপালীকে দেখে শেখ।

এ কথায় দু-এক স্থবির ক্ষুব্ধ হন। সংস্কার ভিক্ষু হলেই যায় না! বলেন—সামান্য গণিকাকে এত খাতির!

ক্ষুব্ধ স্থবিরদের মধ্যে দেবদত্ত প্রধান। তিনি বুদ্ধের বিরোধিতা সুরু করলেন। সেই বাল্যে হংসের অধিকার নিয়ে বিবাদ হয়েছিল, আবার বার্ধক্যে সংঘের অধিকার নিয়ে বিবাদ। হায়! মহাপ্রজাবতী বেঁচে নাই। কে বিবাদ মেটাবে?

দেবদত্ত কৃচ্ছ্রপ্রিয় নারীবিদ্বেষী। তিনি আরাম আয়েস দেখতে পারেন না। বিশাখা আম্রপালীকে সহ্য করতে পারেন না। বললেন—বুদ্ধ বৃদ্ধ হয়েছেন। সংঘের কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হোক।

স্থবিরেরা মাথা নাড়লেন—তা হয় না।

দেবদত্ত অজাতশত্রুর সঙ্গে যুক্তি করলেন। চক্রান্তে স্থির হল: দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করে সংঘের অধ্যক্ষ হবেন। অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করে দেশের রাজা হবেন। একে অপরকে সাহায্য করবেন সাধ্যমত।

আম্রপালী চক্রান্ত ফাঁস করে দিল। বুদ্ধ বেঁচে রইলেন।

*

—হে ভিক্ষুগণ, মুক্ত পুরুষের মৃত্যু প্রদীপের নির্বাণের মতন। নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপঃ। মৃত্যুতে যা নির্বাপিত হয়, তা ব্যবহারিক সত্ত্বা। এই সত্ত্বার বিনাশ হলে পারমার্থিক সত্ত্বার বিনাশ।

বুদ্ধ বুঝতে পারছেন তাঁর আয়ু ফুরিয়েছে। তাই তিনি জেতবনে পঁচিশ বছর কাটাবার পর শেষবারের মত বেরলেন।

প্রথমে গৃধ্রকূট তারপর নালন্দা। সারিপুত্র মৃত্যুশয্যায়, বুদ্ধ তাকে শেষ দেখা দিলেন। নালন্দা থেকে বৈশালী। তিনি আম্রপালীর উদ্যানে রয়েছেন।

বুদ্ধ অসুস্থ। আশী বছরের জীর্ণ শরীর আর চলে না। বললেন—আনন্দ, বস্তুমাত্রই বিনাশশীল। এই দেহ বস্তু ছাড়া কিছু নয়। অচিরেই এ বিনষ্ট হবে

বুদ্ধ পারা গ্রামে চুন্দ কর্মকারের গৃহে অতিথি। চুন্দ তাঁকে আহার্যের সঙ্গে সূকরমদ্দব দিলেন। সূকরমদ্দবের বহু অর্থ: শূকর-মাংস, কন্দবিশেষ, ব্যাঙের ছাতা। সে যা হোক, খাওয়ার পর বুদ্ধের রক্ত আমাশয়। ব্যাধিতে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি বলে বুদ্ধ রোগযন্ত্রণা ভুলে কুশীনগর যাত্রা করলেন। পথে যন্ত্রণা এত বেশী হয় যে হাঁটতে পারেন না। গাছের তলায় চীবর ভাঁজ করে বসলেন।

—আনন্দ, এমন একটি অবস্থা আছে যেখানে ক্ষিতি অপ তেজ

মরুৎ ব্যোম নাই। অথচ এই অবস্থা শূন্যতা নয়। এই অবস্থাকে আমি মৃত্যু বলি না। অতল অচল অনন্ত, এই অবস্থাই নির্বাণ।

আনন্দ ব্যাকুলচিত্ত। বুদ্ধের কথা শুনেও শুনতে পায় না। রুদ্ধ-কণ্ঠে বলল—সংঘের ব্যবস্থা না করে তথাগতের নির্ব্বাণ লাভ করা উচিত নয়।

বুদ্ধ আকাশের দিকে তাকালেন—তথাগত যা করবার করেছেন বহুকাল ধরে, যা বলবার বলেছেন বহুকাল ধরে। আর কিছু করার বা বলার নাই।

উদ্বিগ্ন আনন্দ প্রশ্ন করে—ভদন্ত, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমরা কিরূপ ব্যবহার করব?

—তাদের দিকে তাকিয়ো না।

—যদি তাকাতেই হয়, তাহলে?

—তাহলে কথা বোলো না।

—যদি কথা বলতেই হয়?

—তাহলে সাবধানে বোলো। নারী কামিনীও বটে কল্যাণীও বটে। তাই সাবধানতা।

আনন্দ কাঁদতে লাগল।

[পাঁচ]

বুদ্ধের নির্বাণের পর এক বিচার সভা বসেছে। এ সভায় বিশাখা উপস্থিত নয়, সে মৃত্যুতে নির্বাপিত।

সভাপতি মহাকাশ্যপ বললেন—আনন্দ, তুমি তথাগতের মহাপরি-নির্বাণের পর প্রথমে স্ত্রীলোকদিগকে দেহবন্দনা করতে দিয়েছিলে! কাজটা ভাল হয় নাই! নারীদের চোখের জলে ভগবানের দেহ অপবিত্র হয়েছিল। তোমার দোষ স্বীকার কর।

আনন্দ বলল—ভদন্তগণ, স্ত্রীলোকদের যাতে দেরী হয়ে না যায়, তাই আমি ঐরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম। এতে আমি কোন দোষ দেখছি না। তবু আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি দোষ স্বীকার করছি।

স্থবিরেরা আবার বললেন—আনন্দ, স্ত্রীলোকদের প্রব্রজ্যা নিতে তুমি যে আগ্রহ দেখিয়েছিলে, তাও ভাল কাজ নয়। তোমার দোষ স্বীকার কর।

আনন্দ বলল—ভদন্তগণ, মহাপ্রজাবতী গোতমী ভগবানের স্তন-দায়িনী মাতৃতুল্যা। এই কথা মনে করে আমি ভগবান বুদ্ধকে অনুরোধ করেছিলাম। এতে আমি কোন দোষ দেখছি না। তবু আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি দোষ স্বীকার করছি।

———

শ্রীচৈতন্য

[এক]

দশ মাস দশ দিন হয়ে গেল, তবু শচীমাতার সন্তান হয় না। এ কেমন আতুরে ছেলে, মা-র পেট আঁকড়ে পড়ে আছে। এগারো মাস গেল, ছেলে জরায়ু-ঘরে চুপচাপ। মা বাপ উদ্বিগ্ন। মাঘে মাঘে বছর ঘুরল, পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন নাই। তেরো মাস হতে শচী ভয় পেলেন। লক্ষণ ভাল নয়। শচীর পরামর্শে জগন্নাথ ত্বরায় খবর দিলেন শ্বশুরকে।

সে যুগে বিজ্ঞান সীমিত। শ্বশুর মশাই বৈদ্য না ডেকে গণনা করতে বসলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—জন্ম লভিবে বিশাল প্রাণ। তাই বিলম্ব হচ্ছে।

শুভক্ষণে শিশু জন্মাল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে : চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুণ। পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।

নবদ্বীপ ধামে বৈদিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের আট মেয়ে ও এক ছেলের পর আবার। এই ছেলে কোথায় জন্মেছে? জগন্নাথের বাড়ির উঠোনে নিমগাছ, তার তলায় কুঁড়ে ঘর, সেখানে। বেশ ফুট-ফুটে ছেলে, আকারে সাধারণের চেয়ে অনেক বড়।

শচী ছেলের নাম দিলেন নিমাই। এ নাম কেন? নিমগাছ তলায় হয়েছে, তাই। আর নামে নিমের গন্ধ থাকা ভাল, যমের মুখে রুচবে না।

নিমাই বড় চঞ্চল, কারও কোলে কিছুক্ষণ থাকার পরই ছটফট করে। এমন বলবান্ সে ছটফটানি যে রমণীগণ বিপর্যস্ত হয়ে কোল থেকে নামাতে বাধ্য হয়। তখন নিমাই মিটি মিটি তাকায়। তোমরা আমায় ধরে রাখতে পারবে না, বুঝেছ?

শ্রীহট্ট পাড়ার আচার্যপত্নী বেড়াতে এসেছেন। আচার্য চন্দ্রশেখর প্রতিবেশী আবার আত্মীয়। তিনি শচীর বোনকে বিয়ে করেছেন। মাসীমা নিমাইয়ের কান্না থামাতে পারছেন না। শিশুকে ভোলাতে যা যা করতে হয় সবই করেছেন কিন্তু বৃথা। কী দস্যি ছেলে রে বাবা, ষাঁড়ের মত চেঁচায়।

শচী রান্নাঘর থেকে বললেন—হরিনাম শোনা, তাহলেই থামবে।

মাসীমা হাসলেন। তাই আবার হয় নাকি? তিনি নিমাইয়ের মুখে স্তন গুঁজে দিলেন। তবুও কাঁদে। নিরুপায় মাসীমা অবশেষে হরিনাম জুড়লেন।

আশ্চর্য! নিমাই চুপ।

নিমাইয়ের আর এক নাম বিশ্বম্ভর। এ নাম জগন্নাথ রেখেছেন বড় ছেলে বিশ্বরূপের নামের অনুসরণে।

বিশ্বরূপ আট বছরের বড়, ভাইকে কোলে নিতে পারে। শচীকে বলল—মা, ভাইকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি?

—বেশী দূরে যাস না।

—আচ্ছা।

বলে বিশ্বরূপ ভাইকে কোলে নিল।

খানিকটা গিয়ে বিশ্বরূপ হাঁপাতে থাকে। দশ বছরের ছেলের কত আর শক্তি, নামিয়ে দিয়ে বাঁচল।

নিমাই হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। বিশ্বরূপের অলক্ষ্যে সোজা গঙ্গাপাড়ে হাজির। তারপর এক কাণ্ড। নিমাই সাপ ধরেছে। যতেক স্নানার্থী ভয়ে অস্থির। কিছুক্ষণ পর সাপ চলে গেল, দংশাল না।

এরপর শচী আর নিমাইকে ছাড়েন না। শিশু বাড়ির উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়। অঙ্গদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে, চরণে নূপুর খাড় বাঘনখ গলে।

নিমাই দেখতে বড় সুন্দর। গায়ের রং সোনার মতন, হাতের তলা পায়ের তলা টুকটুকে লাল। আয়ত চোখে রক্তিম আভা আর পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর। রূপবান শিশুকে কোলে নেওয়ার জন্য রমণীদের মধ্যে পড়ে যায় কাড়াকাড়ি।

এক রাতে শচী দেখলেন, জ্যোতির্ময় পুরুষেরা ঘুমন্ত শিশুকে ঘিরে বসে আছেন। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে ভয় পেলেন শচী। শিশুকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জগন্নাথের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

নিমাই উঠোন পেরিয়ে বাপের ঘরে চলেছে আর শচী শুনছেন নূপুর ধ্বনি। নিমাইয়ের পায়ে তো নূপুর নাই, তবে এ ধ্বনি আসে কোথা থেকে?

কোথা থেকে আসে, কৃষ্ণই জানে।

*

নিমাইয়ের হাতে খড়ি হয়েছে কিন্তু লেখাপড়ায় মন নাই। সারা বেলা শুধু খেলা। মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পদকর্তার বর্ণনা এই রকম। শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়, হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়। বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু, শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।

নিমাই শচীর মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে বলছে—মা, আমি লুকিয়েছি।

শচীমাতা বলছেন—কোথায় লুকোলিরে, তোকে দেখছি না।

আসলে নিমাই লুকোয় নাই, শচীর চোখ ঢাকা, তাই দেখতে পাচ্ছেন না। ঈশ্বরের বেলায়ও এমনি। তিনি অত্যন্ত প্রকাশিত: জীবের চোখ মায়ায় ঢাকা তাই দেখতে পাচ্ছে না। এও এক লুকোচুরি খেলা।

শচী নিমাইকে বুকে চেপে ধরে বলেন—হাঁরে নিমাই তুই এমন কেন? বামুনের ছেলে হয়ে ডোম-বাগদির ছেলের সঙ্গে খেলা করিস। শুচি-অশুচি জ্ঞান কবে হবে?

—হবে না।

বলে নিমাই শচীর কোলে শুয়ে পড়ে পা-দু'টি স্তনের ওপর রাখল। চৈতন্যমঙ্গলে আছে : শচীমা-র স্তনযুগে দু'পা রাখিয়ে, সোনার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে।

শুচি-অশুচি বিচার নিমাইয়ের নাই।

পথের কুকুরছানাকে কোল দিল। পরবর্তীকালে আচণ্ডালে কোল দেবেন। দেবেনই তো, শিশু বয়সেই জীবের প্রতি অসীম ভালবাসা। করুণাঘন হৃদয় নিমাইয়ের।

শচীমাতা কুকুরছানা কোলে নিমাইকে দেখে ক্ষেপে গেলেন।

—ওরে কুকুর ছুঁতে নাই। অস্পৃশ্য। যা যা ফেলে দিয়ে আয়।

বললেই হল? নিমাই কুকুর-বাচ্চাকে যত্ন করে বারান্দায় আসন পেতে বসাল। বাচ্চা বসে থাকবে না. নিমাই দড়ি দিয়ে বাঁধল। বেঁধে বলল—ঘুমোবি তো ঘুমো। আমি খেলা করে আসি। এসে খেতে দেব।

শচী এরই অপেক্ষায় ছিলেন। যেই নিমাই বেরিয়েছে. তিনি কুকুরছানা বিদায় করলেন। করে গঙ্গাস্নানে গেলেন।

নিমাইয়ের বন্ধুর অভাব নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ, চণ্ডাল সব জাতের শিশু ওর বন্ধু। এক তন্তুবায় শিশু দৌড়তে দৌড়তে নিমাইয়ের কাছে গেল—তোমার মা কুকুরছানা তাড়িয়ে দিয়েছে।

—অ্যাঁ। নিমাই এক ছুটে বাড়ি হাজির।

—মা, আমার কালু কোথায়?

—কালু? সে আবার কে?

—আমার কুকুরছানা। তাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ।

বলে নিমাই কাঁদে আর ধূলোয় গড়াগড়ি যায়।

নিমাইয়ের তৃণাদপি সুনীচ স্বভাব। ঘাস যেমন সুখে মাটিতে গড়ায়, অহঙ্কারে মাথা তোলে না. তেমনি। নিমাই নাচতে নাচতে ধূলোয় গড়াগড়ি দেয়।

শচী সোনার অঙ্গ আঁচল দিয়ে মুছে দেন। দিলে কী হবে, একটু পরেই ধূলায় ধূসর। শুধু নিমাই না, নিমাইয়ের বন্ধুরাও ধূলায় গড়ায়। নিমাই দুহাত তুলে নাচতে নাচতে রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরল আর দুজনেই পপাত ধরনীতলে। উঠে আবার নাচে। শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া।

চার বছরের ছেলে নিমাই। শচীমা পাকা কলা, নলেন গুড়ের সন্দেশ খেতে দিয়েছেন। খাওয়া ভুলে নিমাই নাচছে, একহাতে কলা এক হাতে সন্দেশ। শচীমা, মাসীমা ও কতিপয় রমণী হাততালি দিচ্ছেন। তাঁদের হৃদয় নাচছে। তাঁরা দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ ভুলে যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেন? তাঁদের বাহ্যজ্ঞান নাই। তন্ময়। ধ্যানস্থ হলে যেমন, তেমনি।

বারকয়েক হরিধ্বনি উঠল।

শচী তাঁর নয়নের মণি নিমাইকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। আয়রে ঘুম, যায় রে ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে…। ঘুম দত্তপাড়া দিয়েই গেল, নিমাই মা-র হাত ধরে দুলছে।

—মা, আমি নাচব।

—তুই কী পাগল?

—হাঁ মা আমি পাগল। কেমন পাগল জান? নিমাই পটের কৃষ্ণের দিকে আঙ্গুল দেখাল। ও যেমন মোহন সুরে বাঁশী বাজাত আমি তেমনি মোহন তালে নাচব।

নিমাই বড় সুন্দর নাচে। হেলে দুলে দুহাত তুলে। কৃষ্ণের বাঁশী শুনে যেমন বৃন্দাবনের নারীগণ পাগল হয়ে যেত, নিমাইয়ের নাচ দেখে তেমনি নবদ্বীপের নারীগণ পাগল হয়ে যায়। বলরাম দাসের পদ আছে: কলসী লইয়া, নাগরিয়াগণ, নাচিবারে ধায়। দাঁড়াইয়া দেখে, জল বহে চোখে, দারুণ কুলের দায়।

নবদ্বীপের নারীদের চোখে জল দেখে নিমাইয়ের চিত্ত ব্যাকুল হয়। শিশু বুঝতে চেষ্টা করে, কেন এ চোখের জল।

নিমাই শচীকে ধরল—মা, আমার নাচ দেখে তোমরা কাঁদ কেন?

—কই, কাঁদি নাতো?

—হাঁ, কাঁদো। আমি দেখেছি তোমাদের চোখে জল।

—ও আনন্দের।

—আনন্দে তোমরা কাঁদ? নিমাই হাসল—মা, আমি নই, তোমরাই পাগল।

নিমাই একথা বলল কিন্তু ভাবনটা পেয়ে বসল। মানুষ আনন্দেও কাঁদে!

নিমাইয়ের মন বুঝি লেখাপড়ায় আর বসল না। কী করে বসবে? রাজ্যের ছেলের সঙ্গে খেলা আর সময়ে অসময়ে দুহাত তুলে নাচ। গোরা নাচে, শচীর দুলালিয়া। চৌদিকে বালক মেলি দেই ঘন করতালি হরিবোল হরিবোল বলিয়া।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের এরকম নেচে বেড়ালে তো চলবে না। লেখাপড়া করতেই হবে, তা না হলে গায়ে থুথু দেবে ভদ্রলোকেরা। শচী একথা নিমাইকে বলতে ও হাসল—মা, আমি ভদ্রলোকের কাছে যাব না। ওই যারা মুখ্যু, যারা খেটে খায়, আমি তাদের কাছে যাব।

—তারপর?

—তারপর তাদের কৃষ্ণকে ভালবাসতে শেখাব। নিমাই মা-র গলা জড়িয়ে ধরল—তুমি যেমন আমাকে ভালবাস তেমনি ওরা কৃষ্ণকে ভালবাসবে।

শচী হেসে উঠলেন কিন্তু জগন্নাথ রেগে গেলেন। ছড়ি তুলে বললেন—আজ তোকে উত্তম মধ্যম দুচার ঘা দেব।

নিমাই ছুটে এসে মা-র কোলে লুকাল। শচী বললেন—তুমি কী গো! ছড়ি ফেলে দাও, শান্ত হও। দেখছ না নিমাই ভয়ে আধমরা।

জগন্নাথ রাগের গলায় বললেন—আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।

—না গো না। আমি নিমাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক বাগে আনব। স্নেহের শাসনও শাসন, একথা মনে রেখো।

জগন্নাথ ছড়ি ফেলে প্রস্থান করলেন। তখন শচীমাতা নিমাইকে বলছেন—তুই যদি আমার কথা না শুনিস, আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।

—মাগো! নিমাই ব্যাকুলকণ্ঠে বলল—তুমি মরবে না। আমি তোমার কথা শুনব।

—তাহলে লেখাপড়ায় মন দে।

—কী হবে মা লেখাপড়া করে?

—আবার ওই কথা।

নিমাই চুপ করে আছে। শচীমাতা জবাব শোনার জন্য ব্যাকুল। বলরাম দাসের বর্ণনা : শচীমা জননী বচন শুনিতে। নিমাইয়ের সাথে কত ছল পাতে॥ চতুর নিমাই জানিতে পারিয়া। চুপ করি থাকে উত্তর না দিয়া॥

নিমাই লেখাপড়ায় মন তো দিলই না, নানা উৎপাত সুরু করল। অবশ্য সাধারণ মানুষের ধারণায় উৎপাৎ, অসাধারণ মানুষের ধারণায় নয়।

নিমাই আস্তাকুঁড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ধরতে এলে গায়ে ভাত মাখে। বাছবিচার নাই, শুচি-অশুচি অভিন্ন। এর নাম সমদৃষ্টি, সাধারণ মানুষ বোঝে না।

নিমাই ধূলোয় গড়াগড়ি যায়, অন্ত্যজশ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে মেশে, রোদ বৃষ্টিতে ঘোরে। এর নাম সমদৃষ্টি। সাধারণ মানুষ বোঝে না।

লোকে শচীকে বলল—তোমার নিমাই পাগল।

শচী প্রত্যয় গেলেন না। পাগল নয়, দেবাবিষ্ট হয় কখনও কখনও।

জগন্নাথের প্রতিবেশী হিরণ্যভাগবতের বাড়িতে একাদশীর পূজো হবে। থরে থরে সাজানো নৈবেদ্য। নিমাই পাড়া বেড়াতে গিয়ে দেখে এল। তারপর শচীর কাছে বায়না।

—মা আমি নৈবেদ্য খাব।

—বলিস কী! শচী জিভ কাটলেন—নৈবেদ্য পূজো শেষ না হলে খায় না। আগে দেবতা গ্রহণ করুন, তারপর আমরা প্রসাদ পাব। দেবতা আগে।

—আমিই তো দেবতা।

শচী কেঁপে উঠলেন। এতটা প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। ধমকালেন—

—চুপ।

নিমাই কাঁদতে লাগল। সে কী কান্না, অঝোরে চোখের জল পড়ে। শচী কিছুতেই কান্না থামাতে পারলেন না।

হিরণ্যভাগবত বাড়িতে এলেন। নিমাইয়ের কান্না দেখে ব্রাহ্মণের হৃদয় গলে গেল। আহা! এমন সুন্দর শিশু কাঁদতে কাঁদতে এলিয়ে পড়েছে। তিনি নৈবেদ্য নিয়ে এলেন—তুমিই কৃষ্ণ। তোমাকেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করলাম।

নিমাই কিছু খেল, কিছু গায়ে মাখল, কিছু বিলিয়ে দিল।

শচী উদ্বিগ্ন। দেবাবিষ্ট ঠিক তো? না অপদেবতার কর্ম? তিনি বোনকে খবর দিলেন। মাসীমা একা এলেন না, পাড়ার ক'জন বিজ্ঞ গৃহিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। আলাপ আলোচনার পর সাব্যস্ত হল, এ অপদেবতারই কাজ।

নিমাই রমণীসভায় হাজির। সকলের দৃষ্টি ওর উপর। এমন সুন্দর শিশুকে ভূতে ধরল। হায়। এক গৃহিণীর মনে সংশয়। তিনি নিমাইকে বললেন—তুমি দেবতা মান না?

—না। আমিই দেবতা। আমি আবার দেবতা মানব কেন?

গৃহিণী প্রত্যয় গেলেন, নিমাইকে ভূতে ধরেছে। দেবতুষ্টি

প্রয়োজন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। ষষ্ঠী পুজোও দিতে হবে। বলরাম দাসের পদ আছে : পণ্ডিতের নারী, সবে বড় জ্ঞানী, শচীরে উপায় বলে। ষষ্ঠীঠাকুরাণী, পূজ পদখানি, ভাল হবে তোর ছেলে।

শান্তি স্বস্ত্যয়ন, ষষ্ঠীপূজা সবই হল কিন্তু নিমাই যেমন ছিল তেমনই রইল। ভাবের পাগল।

*

নিমাইয়ের বয়স ছ'বছর। পথে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করছে, কান্না শুনতে পেল। কে কাঁদে? নিমাই খরগোসের মত কান খাড়া করল—আরে! মা কাঁদছে।

নিমাই এক ছুটে বাড়ি এল। কী ব্যাপার? দাদা সন্ন্যাস নিতে গেছে শুনে ও মূর্চ্ছা গেল।

শচী বড় ছেলের শোক ভুললেন। বিশ্বরূপ গেছে কিন্তু বিশ্বম্ভর আছে। এক চোখ চোখ নয়, এক পুত পুত নয়। ভাগ্যিস ঠাকুর দুটো ছেলে দিয়েছিল। উনি নিমায়ের চোখ মুখে জলের ছিটা দিলেন। তারপর ও যখন চোখ মেলল শচী পাগলিনী প্রায় ছেলের চুমো খেতে থাকেন।

নিমাই এক নিমেষে বদলে গেল। শচীর ক্লিষ্ট মুখ দেখে বলে—মা, আমি তো আছি।

নিমাই লেখা-পড়ায় মন দিল। যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় না, পথে-বিপথে খেলা করে না। শচীর বুকে আশাপাখি ওড়াওড়ি করে।

*

হরিষে বিষাদ। যখন শচী নিমাইকে ঘিরে গেরস্থালি স্বপ্ন দেখছেন, তখন এক ঘটনা।

সুপারি খেয়ে নিমাই মূর্চ্ছা গেল। এরকম অনেকবার হয়েছে, তাই শচী ভয় পেলেন না। চোখে মুখে জল দিলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে নিমাই বলল—মা, দাদা এসেছিল।

—হ্যাঁ।

—দাদা বলল, বিশ্বম্ভর আমার মত সন্ন্যাসী হ।

—তুই রাজী হলি?

—না। নিমাই মাথা নাড়ল। একটু ভেবে বলল—মা, আমি তোমার কাছে থাকব। কিছুতেই দূরে যাব না।

রাত্রে শচী সব কথা স্বামীকে বললেন। জগন্নাথের চোখের ঘুম ছুটে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন। জ্ঞানচর্চা করে বিশ্বরূপ সংসার বিমুখ হয়েছে। বিশ্বম্ভরকে জ্ঞানচর্চা করতে দেবেন না। যেখানে সুখ রয়েছে, সেখানে অজ্ঞানই থাকুক।

সকালে জগন্নাথ নিমাইকে বললেন—তুমি যেমন খেলাধুলো করতে তেমনি কর, লেখাপড়া করতে হবে না।

নিমাই খেলা সুরু করল।

বালক নিমাই গঙ্গায় নামলে আর ওঠে না। স্নানার্থীদের জ্বালিয়ে ছাড়ে। কারও পা টানে, কারও পুজোর ফুল কাড়ে। লোকে জগন্নাথকে বলে, জগন্নাথ কথা কানে তোলেন না। লেখাপড়া করতে না দিলে ওরকম তো করবেই।

গৃহিণীরা শচীকে বলতে লাগলেন। তিনি অভিযোগ হওয়ায় উড়িয়ে দিলেন না। নিমাইকে ধমকালেন—এসব কী করছিস আজকাল?

—মুর্খের এসবই তো কাজ। আমি তোমাকেও জ্বালাব। পদকর্তার বর্ণনা আছে: শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার। সেসব শচীর কাছে সুখের পাথার॥

নিমাই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হাঁড়ি সাজিয়ে তার ওপর জুৎ করে বসল। চেঁচিয়ে বলে—মা মূর্খ রাজার সিংহাসন দেখবে এস

শচী নাচ দুয়োরে আসতে অবাক।

—কী কাণ্ড!

—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ভাণ্ডের উপর ভাণ্ড, তার উপর ভাণ্ডেশ্বর।

নিমাই হা হা হাসতে থাকে।

এদিকে ভিড় জমে গেছে। রমণীগণ শচীকে বলে—পড়া বন্ধ করে ভাল কর নাই।

শচী সবকথা স্বামীকে বললেন। জগন্নাথ দায়ে পড়ে রাজী।

*

নিমাই নয়ে পা দিল। এবার ওর পৈতে হবে।

পুরোহিত বিষ্ণু পণ্ডিত এলেন। গায়ে হলুদ, মাথা কামানো, সবই হল। জগন্নাথ পুত্রের কানে গায়ত্রী মন্ত্র বলছেন, ও হুঙ্কার করে মূর্চ্ছা গেল। দুচোখ বেয়ে অবিরল জল পড়ে।

পণ্ডিতগণ নিমাইয়ের শারীরিক লক্ষণ পরীক্ষা করলেন। পুলকিত তনু, জ্যোতির্ময় শরীর, নয়নে অশ্রুধারা। অনুমান করেন, দেবাবিষ্ট তাঁরা নাম দিলেন ঃ গৌর হরি।

উপবীত ধারণের পর ব্রাহ্মণকে নিভৃত বাস ও পরে ভিক্ষা করতে হয়। নিমাইকে এক ব্রাহ্মণ সুপারি ভিক্ষা দিলেন। সেটি মুখে দিয়ে নিমাই ডাকল—মা।

শচীমাতা ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না, চোখ যেন ঝলসে যায়। অমিত তেজ তাঁর পুত্র।

নিমাই বলল—তুমি একাদশী পালন করিবে।

শচী বাক্যহারা। তাঁর পুত্র বজ্রনির্ঘোষে আদেশ করছে। তিনি অপরাধিনী-প্রায় বললেন—তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য।

—উত্তম। এবার শোন। নিমাই অতি গম্ভীর স্বরে বলল—আমি চলিলাম। যে রইল সে তোমার পুত্র।

বলে নিমাই মূর্চ্ছা গেল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর নিমাই ইতিউতি চায়। যেন কোন দূরদেশ থেকে অনেক কাল পর বাড়ি ফিরল। শচী নিমাইকে বুকে টেনে নিলেন। তাঁর বড় আদরের ছেলে। কী হবে নিমাইয়ের কে জানে। আমি চলিলাম, বলে যে গেছে সে তো আবার আসবে। এসে কী করবে?

*

শচীর দুশ্চিন্তা কমেছে। দিন কাটছে বড় সুখে। স্বামীর রোজগার বেড়েছে। পুত্র মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করছে। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কী অপরূপ চেহারা হয়েছে নিমাইয়ের। যেন দেবকুমার।

সহসা দুঃখ এল শচীর জীবনে। জগন্নাথ মারা গেলেন। শচী নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুক বাঁধলেন। এই ছেলেই এখন তাঁর সব। তিনি ওকে নিয়ে গেলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে।

বললেন—পণ্ডিত, আমি বিধবা। আমার বড় ছেলে সন্ন্যাসী। নিমাইকে কী করে মানুষ করব জানি না। তুমি যদি সহায় হও, আমি নিশ্চিন্ত হই।

—আপনি নিশ্চিন্ত হন, আমি যথাসাধ্য নিমাইকে শেখাব। পিতৃহীন বলে অবহেলা করব না। গঙ্গাদাস নিমাইকে কাছে বসালেন।

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়ে। মেধাবী ছাত্র বলে ওর খুব নাম। সহপাঠী কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি গুপ্ত, রঘুনাথ নিমাইয়ের সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠে না।

শচীর পুত্রগর্বে বুক ভরে যায়। রঘুনাথ এক প্রহর, কখনও কখনও দুপ্রহর পাঠ অভ্যাস করে। আর নিমাই? অর্দ্ধপ্রহরও না। তবু ও পরীক্ষায় প্রথম হয়। বলরামদাসের পদ আছে : রঘুনাথ পড়ে মনোযোগ দিয়া। নিমাই বেড়ায় অতি চঞ্চলিয়া॥ কখন যে পড়ে, কেহ নাহি জানে। তবু রঘুনাথ, নারে তার সনে॥

নিমাই খেতে বসলে শচী বললেন—ব্যঞ্জনটুকু খেয়ে নে।

—না।

—কেন?

—তুমি শুধু ভাত খাবে, সে হয় না।

—পাগল ছেলে, আমার আছে।

নিমাই মুখ তুলল—দেখ মা, আমি সব বুঝি। বুঝে অবাক হই।

শচী ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলেন।

ভোজনের পর নিমাই পুঁথি নিয়ে বসল। শচী বললেন—কার সঙ্গে তর্ক করবি?

—মুরারির সঙ্গে।

বলে নিমাই কেমন থিতিয়ে গেল।

শচী নিমাইয়ে গায়ে হাত রাখলেন। নিমাইয়ের মনে হল, অঙ্গ জুড়িয়ে যায়। বলল—মা তোমার স্পর্শে যাদু আছে।

—যাদুবিদ্যা আবার কবে শিখলাম?

—যেদিন মা হয়েছ। মা-র ভালবাসার চেয়ে বড় যাদু নাই।

নিবিড় স্নেহে নিমাইয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন শচীমাতা।

*

নিমাইয়ের বয়স মাত্র ষোল। এই বয়সেই ব্যাকরণ ও ন্যায় অধিগত। ও মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলল।

শচীমাতা আনন্দ সাগরে ভাসছেন। এইবার বিয়ে দেবেন নিমাইয়ের। ঘরে টুকটুকে বউ আসবে। তিনি চাবিগোছা তার আঁচলে বেঁধে নিশ্চিন্ত হবেন।

বনমালী ঘটক সম্বন্ধ আনল। পাত্রী বল্লভাচার্যের সুরূপা কন্যা লক্ষ্মী। শচী নিমাইকে বিয়ের কথা বলতেই রাজী।

—মা, তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে। আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজই করব না।

—কোন কাজই না?

—কোন কাজই না। যদি আমার ইচ্ছার সঙ্গে তোমার ইচ্ছা না মেলে আমি তোমাকে বোঝাব।

—যদি আমি না বুঝি?

—তুমি আমার মা। নিশ্চয় বুঝবে।

যথাসাধ্য বিয়ের আয়োজন করল মা ও ছেলে। আলো জ্বলল।

বাজনা বাজল, পাড়াপড়সীরা এল। কিন্তু জগন্নাথ এল না। বিশ্বরূপ এল না। বাবা ও দাদার জন্য নিমাই কাঁদছে। সকলে বলল, নিমাইয়ের অন্তরে অনন্ত ভালবাসা।

[দুই]

নিমাই এখন যুবক। তাঁর বাড়িতে ভালবাসার মানুষ দুজন। জননী ও জায়া। জননীর ভালবাসা বাৎসল্যের আর জায়ার ভালবাসা মধুর। বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, মধুর। ভালাবাসার নানারূপ।

নিমাই পণ্ডিতের এক সখা রঘুনাথ। তিনি নিমাইয়ের লেখা ন্যায়শাস্ত্রের টিপ্পনী পড়ে কাঁদতে লাগলেন। নিমাই বললেন—কাঁদ কেন, সখা?

—দুঃখে। তোমার এই টিপ্পনী প্রকাশিত হলে আমার টিপ্পনী কেউ ছোঁবেও না।

—এই কথা। নিমাই তাঁর টিপ্পনী গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন—অকল শাস্ত্রে কিবা প্রয়োজন। নাম যশ চাই না ভাই। যেন তোমার ভালবাসা পাই।

নিমাইয়ের ন্যায়ের চর্চায় মন নাই। তিনি এবার ভালবাসার পাঠ নেবেন। ভালবাসাই সকল শাস্ত্র।

তরুণ নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদের নিয়ে চলেছেন, মুকুন্দ তাঁকে দেখে পাশ কাটালেন। নিমাই ছাত্রদের বললেন—মুকুন্দ পালায় কেন?

—মনে হয়, বাড়িতে কাজ আছে।

—না। মুকুন্দ বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়ে। ন্যায়ের কূটকচালি পছন্দ করে না, তাই আমাকে এড়িয়ে চলে।

নিমাই পণ্ডিত, যাতে মুকুন্দ শুনতে পায়, চেঁচিয়ে বললেন—

আমিও বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়ব। ভালবাসার পাঠ নেব। তারপর তোকে ভালভাবে বাঁধব ভালবাসার বাঁধনে।

ছাত্রগণ পণ্ডিতমশাইয়ের অদ্ভুত কথা শুনে হাসল। ভালবাসার পাঠ! সে আবার কী?

*

নিমাই পণ্ডিত সারাদিন অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনা নিয়ে ব্যস্ত। বালিকাবধূর সঙ্গে কথা বলার সময় পান না, সুযোগও আসে না।

শ্রীহট্টে পিতামহের বাড়ি যাবার কথা হতে, নিমাই লক্ষ্মীকে বললেন—অনেক দূরদেশে যাচ্ছি। ফিরতে কয়েক মাস লাগবে। তুমি ভাল-ভাবে থেকো। কেমন?

লক্ষ্মী চোখে জল এনে ফেলল। বলে—আমার ভয় করছে খুব।

—ভয়? কিসের ভয়?

—জানি না। লক্ষ্মী স্বামীর কবাট বক্ষে মাথা রাখল।

নিমাই শরীরে শিহরণ বোধ করলেন। এর নাম ভালবাসা? গভীর চিন্তার পর মাথা নাড়লেন। আত্মসুখপ্রীতি ইচ্ছা, তারে বলে কাম তাহলে প্রেম কী?

লক্ষ্মী মাথা তুলল। বলে—তুমি, ফিরে এসে আমাকে দেখতে পাবে না।

—কেন?

—আমি মরে যাব।

—কী করে জানলে?

—আমার মন বলছে।

নিমাই অপলক তাকিয়ে থাকেন লক্ষ্মীর দিকে। শরীর আর মন। আলো আর ছায়া। তিনি মেলাবেন দুটোকে।

বললেন—লক্ষ্মী, তোমার মন ভাল নাই।

—নাইই তো। কেমন করে থাকবে?

—তা ঠিক। স্বামী দূর দেশে যাবে জানলে কোন বধূর মন ভাল থাকতে পারে?

একটু ভেবে নিমাই বললেন—পারে লক্ষ্মী, পারে। তুমি নিজের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা কোরো না। কৃষ্ণের কথা চিন্তা কর।

বালিকা বধূ আর কিছু বলল না।

*

নিমাই পণ্ডিত পূব বাংলায় কৃষ্ণনাম গেয়ে বেড়ান। বঙ্গবাসী অবাক। ন্যায় ও ব্যাকরণের পণ্ডিতের এ কোন আচরণ?

নিমাই বললেন—সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বুঝেছি, কৃষ্ণনামই সারবস্তু। নাম ভজরে, নাম চিন্তরে, নাম কররে সার।

বিদগ্ধ ব্যক্তি বললেন—এ মূর্খজনোচিত বিচার।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বললেন—অন্ত্যজ বৈষ্ণবেরা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করে।

নিমাই বললেন—আমাদেরও করতে হবে। তা ছাড়া মুক্তি নাই।

বিদগ্ধ ও শাস্ত্রজ্ঞ সমস্বরে বললেন—আপনার স্পর্ধা কম নয় তো। আপনি কে?

তপন মিশ্র এগিয়ে এলেন—উনি পূর্ণ অবতার। ধর্মসংস্থাপনে কলিযুগে সম্ভব হয়েছেন।

নিমাই পণ্ডিতের বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়। নিম্নস্বরে বললেন—জীবে ভগবৎ বুদ্ধি ভ্রান্তবিচার। মিশ্র, তুমি কাশী যাও। সেখানে নাম প্রচার কর। আমি এখানে রইলাম।

বঙ্গবাসী ধীরে ধীরে নিমাই পণ্ডিতের ভক্ত হয়ে উঠল। ফলে যা ঘটল তা হিন্দুর সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ, শূদ্র, নমঃশূদ্র সমস্বরে কৃষ্ণনাম করে। অন্ত্যজেরা অস্পৃশ্যেরা আর যবন ধর্মের আশ্রয় চায় না। চৈতন্যমঙ্গলে আছে: চণ্ডাল পতিত কিংবা সজ্জন দুর্জন। সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম।

নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে ফিরে চললেন, শ্রীহট্ট আর গেলেন না। কেন যেন মন কেমন করে।

সন্ধ্যাবেলায় নিমাই বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে বিবিধ তৈজসপত্র ও বস্ত্রসম্ভার। শান্তিপুরের তাঁত বস্ত্র সূক্ষ্ম, ঢাকার তাঁতবস্ত্র সূক্ষ্মতর। আর ঢাকার শঙ্খ অপরূপ, শিল্প শোভার সার।

মেসোমশাই বললেন—আমাকে একটি শঙ্খের অঙ্গুরীয় দিতে হবে।

নিমাই বলল—দিমু। একটি ক্যান, দুইটি দিমু।

সকলে হাসল।

নিমাই পণ্ডিত ভেতর বাড়িতে এসে মাকে প্রণাম করলেন।

—মা, তোমাকে কৃশ দেখায়। অসুখ করেছিল কী?

—না। আমি ভালই আছি। কোথায় কৃশ?

—কৃশ না? তাহলে মলিন। কিছু হয়েছে কী?

শচীমাতা কেঁদে ফেললেন—লক্ষ্মী নেই।

—কী হয়েছিল, মা?

—সর্পাঘাত। চিকিৎসায় কোন উপকার হয় নাই।

নিমাই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আকাশ পানে। নিয়তি-কেন বাধ্যতে। লক্ষ্মীর কপালে সর্পাঘাত ছিল। হায়!

শচীমাতা নীরবে অশ্রুপাত করছেন। নিমাইয়ের চোখ থেকেও দুফোঁটা জল পড়ল। লক্ষ্মী, তুমি বলেছিলে আর দেখা হবে না। সত্যই তাই।

*

নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যাপনা সুরু করলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়স কিন্তু মধ্যবয়স্ক বৈয়াকরণেরা তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠেন না। তাঁর যশ খ্যাতি বিস্তৃত হয়। টোল ছাত্রে ভরে ওঠে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছেঃ প্রতিদিন দশবিশ ব্রাহ্মণ কুমার। আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার।

যে পণ্ডিতের কয়েক শত ছাত্র এবং তাদের অনেক অভিভাবক বিত্তবান, তাঁর অভাব কী? শচীর সংসার স্বচ্ছলতায় ভরে ওঠে। প্রতিদিন শচীমাতা কতিপয় সাধু সন্ন্যাসীকে ভোজন করান।

অন্নদান নিমাইয়ের বড় প্রিয়। প্রথমে দান করতে শেখ। তারপর রিপু দমন করতে শেখ। তারপর দয়া করতে শেখ।

শচীর শরীর পোক্ত নয়, বয়স তো হল। তবু দুই প্রহর বেলা পর্যন্ত রন্ধনশালায় পরিশ্রম করেন। দশবিশ জন অতিথি।

নিমাই বলেন—মা, তোমার বড় কষ্ট।

—অতিথি সেবায় আবার কষ্ট কী?

নিমাইয়ের বুক আনন্দে ভরে যায়। এমন মা তাঁর।

*

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী নবদ্বীপে এসেছেন।

গ্রীষ্মকাল। নিমাই পণ্ডিত সশিষ্য গঙ্গাপাড়ে বসে আছেন। স্নিগ্ধ সমীরে শরীর জুড়িয়ে যায়। কেশব পণ্ডিত সদলে সেখানে এলেন।

—তুমি নিমাই পণ্ডিত?

নিমাই নিরুত্তর।

কেশব বললেন—তোমার ব্যাকরণে বড় খ্যাতি।

নিমাই বললেন—ব্যাকরণ পড়াই এইমাত্র। বিচার কাব্যেরই হোক। আপনি দুই একটি গঙ্গাস্তব রচনা করে শোনান।

কেশব ঝড়ের বেগে রচনা করে গেলেন অনেকগুলি শ্লোক। তারপর বললেন—কোনটি নিয়ে বিচার হবে?

নিমাই বললেন—মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্, যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা।

কেশব অবাক। নিমাই ঠিক মনে রেখেছে। শ্রুতিধর নাকি?

এরপর শ্লোকের দোষগুণ দুজনেই বিচার করলেন। কেশব মেনে নিলেন নিমাই পণ্ডিতের বিচার উন্নততর মানের।

কাশ্মীরী কেশব সমুদয় সামগ্রী বিলিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হলেন। আর

নবদ্বীপবাসী নিমাই পণ্ডিতকে দোলায় তুলে বাদ্যবাজনা করে নগর পরিক্রমা করল। জয়, নিমাই পণ্ডিতের জয়।

জয়ধ্বনি শুনে শচীর চোখের মণি নড়ল। ছেলের আবার বিয়ে দিতে হবে।

*

শচীর সঙ্গে মালিনীর বড় সদ্ভাব যদিও মালিনী বয়সে অনেক ছোট। মালিনী পরম বৈষ্ণব শ্রীবাসের ঘরণী। শ্রীবাস জগন্নাথের আত্মীয়, সুতরাং মালিনী শচীর আপনজন।

শচী মালিনীর কাছে গেলেন।

সকাল বেলা। মালিনী স্নান করে কপালে চন্দনের রসকলি কেটেছে। কুন্দ ফুল তুলতে তুলতে গুন গুন করছে—যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ, গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন।

শচীকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল।

—এস এস দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জননী এস।

—মালিনী! তুমি কী নিমাইয়ের জয়ে সুখী নও?

—সুখী। পরম সুখী। তোমার ছেলে গুণের গুণধাম।

মালিনীর সুন্দর মুখে বিষাদ ছড়িয়ে যায়। শচীর দৃষ্টি এড়াল না। বললেন—মনের কথা খুলে বল।

—দিদি, নিমাই বৈষ্ণবের ছেলে। তার মুখে নাস্তিকতা শোভা পায় না।

—কী বলেছে নিমাই?

—গতকাল নিমাই ওঁকে বলেছে, আমিই ভগবান।

শচীমাতা থিতিয়ে গেলেন। দেবাবিষ্ট হলে নিমাই এরকম বলে, হুঙ্কার করে, মূর্চ্ছা যায়। এর তো কোন প্রতিকার নাই।

এই সময় শ্রীবাস বাগানে এলেন। কুন্দফুলের ঝাড়টি তাঁর বড় প্রিয়। নিত্য পরিচর্যা করেন। বললেন—সব কুশল তো?

—কুশল। আপনার কাছে সামান্য প্রয়োজনে এসেছিলাম।

নিমাইয়ের আবার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। সুলক্ষণা কন্যা আপনার সন্ধানে আছে ?

শ্রীবাস ক্ষণকাল ভাবলেন। ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি বেশী মেশেন না, বৈষ্ণবদের নিয়েই তাঁর সমাজ। সে সমাজের প্রায় সকলেই দরিদ্র, শচী কী তাঁদের মেয়েকে পুত্রবধূ করবেন ?

বললেন—তেমন ভাল সম্বন্ধ স্মরণ করতে পারছি না। আপনি কাশী ঘটককে বলুন।

শচী আর কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পর শ্রীবাস বললেন—কেশব কাশ্মীরীকে পরাস্ত করার পর নিমাইয়ের কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

—কী রকম পরিবর্তন ?

—বলছি। কাল নিমাই পণ্ডিত পট্টবস্ত্র পরিধান করে তাম্বুল চর্বণ করতে করতে পথ চলছিল, আমাকে দেখে নমস্কার অবশ্য করল কিন্তু মুখে উপেক্ষার হাসি।

—উপেক্ষার ?

—বোধ হয়। শ্রীবাস বিনয়ের সঙ্গে বললেন—আগের দিন কথায় কথায় ওকে বলেছিলাম আমি তাঁর দাস। ও তৎক্ষণাৎ বলল—আমি কারও দাস নই। আমি তিনিই। একা বৈষ্ণব ধারণাকে উপেক্ষা নয় ?

শচীমাতা ভাবতে লাগলেন। দেবাবিষ্ট হলে নিমাই এরকম বলে থাকে কিন্তু সহজ অবস্থায় তো বলে না।

বললেন—আমি নিমাইকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি ওকে বুঝিয়ে বলবেন।

মালিনী বললেন—সেই ভাল

*

নিমাই অত্যন্ত সুপুরুষ। এবং বিপত্নীক নবীন যুবা। স্বভাবতঃই যুবতীগণ ওকে মুগ্ধ চোখে দেখে, কটাক্ষও করে। আর কমবেশী পরিচিতেরা গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়।

নিমাই প্রশ্রয় দেন না। মাথা নীচু করে পথ চলেন, বেগতিক দেখলে পাশ কাটান। তাঁকে মজানো সহজ নয়। তিনি ছলনায় মজেন না, চতুরালি করে মজিয়ে বেড়ান। তাঁর যেমন ভগবান ভাব তেমনি আবার ভক্ত ভাব। তিনি ভক্তভাবে কলাবতী রমনীর ন্যায় ব্যবহার

করেন। সে ব্যবহার কীরকম? নরম চাউনি, মিষ্টি কথা, কোমল ভঙ্গিমা। এসবের শক্তি কম নয়। ফুলের ঘায়েও মানুষ মূর্চ্ছা যায়।

নিমাই তাম্বুলিয়াকে মিষ্টি চাউনিতে ভুলিয়ে পান খেলেন। তন্তুবায়কে মিষ্টি কথায় বশ করে বস্ত্র সংগ্রহ করলেন। শিষ্য বস্ত্র নিয়ে বাড়ি গেল। গুরু ভাবছেন এবার কী করা যায়।

মা-র আদেশ মনে পড়তে নিমাই শ্রীবাসের বাড়ি গেলেন।

—প্রভু, ক্ষমা করুন আমাকে।

—উদ্ধত শিরোমণি। শ্রীবাস হাসলেন—বৈষ্ণবের ক্ষমাই ধর্ম। আমি তোমাকে পূর্বেই ক্ষমা করেছি। কৃষ্ণের কৃপায় তোমার সুমতি হোক।

মালিনী পুজো সেরে ঠাকুরঘর থেকে বেরোলেন। হাতে প্রসাদের থালি কণ্ঠে গানের কলি: মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিলু···। নিমাই ভক্তিভরে প্রসাদ নিল, কোন চপলতা নাই।

মালনী বলল—নিমাই তুমি অত্যন্ত কপট।

—কী ভাবে বুঝলে?

—পরম বৈষ্ণব হয়েও তুমি অদ্বৈতবাদীর মত কথা বল।

—আমি পরম বৈষ্ণব?

—হাঁ গোঁসাই। মালিনী মৃদু হাসল—তুমি বৈষ্ণবের পুত্র, সুতরাং পরম বৈষ্ণব।

—শুনে সুখী হলাম। নিমাই মালিনীর চোখে চোখ রাখল—এবার আমাকে একটি পরমা বৈষ্ণবী জুটিয়ে দাও।

নিমাই সাধারণতঃ রমনীর সঙ্গে রসিকতা করে না কিন্তু মালিনীর মুখে এক পবিত্র ছায়া।

মালিনী বলল—সে ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন আমাকে বল দেখি, কবে ন্যায়ের কচকচি ত্যাগ করছ?

—ত্যাগ করে কী করব?

—তাকে ভোগ করবে। শ্রীকৃষ্ণের ভজনাই শ্রেষ্ঠ ভোগ।

—তুমি আমাকে দলে টানতে চাও?

—চাই।

—তোমার স্বার্থ কী?

—নিমাই, তুমি সাধারণ মানুষ নও। তুমি জ্ঞানী, কুশলী, ব্যক্তিত্ব-

সম্পন্ন। তোমার মত একজন যদি বৈষ্ণবসমাজকে চালিত করে তবেই সনাতন ধর্ম রক্ষা পায়। নচেৎ নিম্নশ্রেণীর সব মানুষ যবন হয়ে যাবে।

সাধক জীবনে নারী প্রেরণা।

*

শচীমাতা কাশী ঘটককে ডেকে পাঠালেন। পাত্রীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন, ঘটকালি করলেই হবে।

কাশী বাড়ি এলে শচী বললেন—গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখলাম। বেশ মেয়ে। সুশ্রী, নম্র, ভক্তিমতী। বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমার খুব পছন্দ। তুমি সম্বন্ধ কর।

দু'পক্ষের কথা হয়। অনেক কথা। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। রূপের কথা, গুণের কথা, বংশের কথা, মিলের কথা। শচী আর সনাতনের কথা ফুরোয় না।

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া তার কিশোরী হৃদয়খানি মেলে ধরেছে। গঙ্গায় স্নান করতে যায় আর ইতিউতি তাকায়। চাঁচর চিকুর কেশ অধরে হাসির রেশ, ভুবনমোহন নিমাই। সে কোথায়? দেখতে না পেলে বিষ্ণুপ্রিয়া আবার নাইতে আসে। একবার দুবার নয়, বহুবার। তাকে না দেখলে যে শান্তি নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতাকে দেখতে পেয়ে ত্বরায় তাঁর কাছে গেল। মা, সে কোথায়? আর একটু হলেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করে ফেলেছিল। কী লজ্জা! বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতাকে প্রণাম করলে তিনি ওর চিবুকে হাত দিলেন। আহা কী রূপ! থির বিজুরী বরণ গোরী। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আছে: বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখবাণা সোণা। ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা।

শচী বললেন—মা, চিরসুখী হও।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে জল এসে যায়। বলে—আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাকে পাই, তবেই আমার সুখ।

*

গণক ঠাকুর পথে নিমাইকে পেয়ে হাসলেন।

—পণ্ডিত, কোথায় যাচ্ছি জান?

—কেমন করে জানব? তোমার গতিবিধির উপর তো নজর রাখি না।

—নজর ঠিকই রাখ।

—তাই নাকি? নিমাই ঠোঁট ছড়ালেন—তাহলে আর জিজ্ঞাসা কর কেন? সত্বর গিয়ে লগ্ন স্থির কর।

—তোমার বুঝি দেরী সহ্য হয় না?

—ঠিক বলেছ গণকঠাকুর। আমি আর অপেক্ষা করতে অক্ষম।

বলে নিমাই শব্দ করে হাসলেন—ঠাকুর, তুমি যা ভাবছ তা ভুল। আমি বিয়েপাগল বামুন নই। আমি বিয়ে করব না।

গণক ঠাকুর সনাতনমিশ্রের পুকুরঘাটে পা ধুচ্ছেন, মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এসে যায়। ভেতর বাড়ির পিঁড়িতে আসন পাতা ছিল, তিনি জুৎ করে বসলেন।

সনাতন মিশ্র বিত্তবান্। বাড়ির দাসী গণক ঠাকুরকে পাখা করছে, অন্যজন জলপানের আয়োজনে ব্যস্ত। সনাতন লগ্ন স্থির করতে বললে গণক দুঃখের গলায় বললেন—মহাশয়, এ বিয়ে হবে না।

—কেন?

—নিমাই বিয়ে করবে না।

অন্তরালে বিষ্ণুপ্রিয়া এ কথা শুনল। শুনে বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেল। তাহলে? বিধি যদি বাম হল, তাহলে এ ছার জীবন কেন? গঙ্গায় ডুবে মরাই ভাল।

সনাতনের স্ত্রী কন্যাকে প্রবোধ দেন—গণকের কথায় বিশ্বাস নাই। আমি সঠিক সংবাদ নিচ্ছি। শচীর কাছে দূতী এল।

নিমাই খেতে বসলে শচী বললেন—আমি আর এখানে থাকব না। তুই আমার কাশীবাসের ব্যবস্থা করে দে।

—বুঝেছি। নিমাই মা-র মুখের দিকে তাকাল—তোমার রাগ হয়েছে আমার উপর। কী অপরাধ করলাম?

—অপরাধ গুরুতর। তুই আমার অসম্মান করেছিস।

—অসম্ভব।

—তোর জন্য আমি মেয়ে পছন্দ করলাম, ঘর দেখলাম, কথা দিলাম। এখন তুই বলছিস, বিয়ে করব না।

—কখন বললাম তোমাকে?

—আমাকে নয়, গণক ঠাকুরকে বলেছিস।

—এই কথা। নিমাই প্রবল হাসল।

হেসে বলল—মা, তুমি তোমার ছেলের স্বভাব জান না? মাঝে মাঝে আমি উলটপুরাণ বলেই থাকি।

শচী সনাতন মিশ্রের বাড়ি লোক পাঠালেন। বিয়ে হবে।

*

গোধূলি লগ্নে বিয়ে।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে পিঁড়িতে বসিয়ে তুলে ধরা হল। কিশোরী লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না। তাহলে শুভদৃষ্টি কী করে হয়? এক অভিজ্ঞা রমণী বলল—শুভদৃষ্টি না হলে অমঙ্গল। অমনি বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ তুলল। বলরাম দাসের বর্ণনা আছে: ঘোমটা আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, আড়চোখে হেরে পতি মুখ ছবি। ভাবছেন মনে কি সুন্দর মুখ, কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ দেখে ভাবছেন, কি সুন্দর মুখ, এ মুখের তুলনা হয় না। তিনি বরমাল্য হাতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিয়ে দিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যামালা হাতে নিমাইকে পরিয়ে দিলেন।

মালা বদলের পর দুজন পাশাপাশি দাঁড়ালেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মিলনসুখে ভাবছেন এইরকম। দক্ষিণে দাঁড়ায়ে এটি মোর বর, এ ধন আপন নহে গো পর। মুখ হেট করে হেরিছে চরণ, আপনারে চির করিছে অর্পণ। আর নিমাই মিলন সুখে ভাবছেন এই রকম। পাশে দাঁড়ায়ে এটি মোর বউ, স্ত্রী বই নহে আর কেউ। ছুঁয়ে তার বাহু বলিছে মনে, তোমারে আমি রাখিব যতনে।

বর কনে বাসরঘরে চলেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে স্বপ্নের ঘোর, স্পষ্ট দেখছে না। চৌকাঠে হোঁচট খেল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উড়ে গেছে, রক্ত বয়ে যায়। নিমাই ত্বরায় ক্ষতস্থান চেপে ধরলেন। ভয় নাই প্রিয়া, আমি আছি।

*

বড়সুখে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দিন কাটছে। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর

জীবন ভরে দিয়েছে ভালবাসায়। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কেবলই ভাবেন আর বিস্মিত হন। এমন তো আগে হয় নাই ; এখন হচ্ছে কেন ?

নিমাই পণ্ডিত কার্যকারণ সম্বন্ধে বিশ্বাসী। বিবেচনা করে বুঝলেন, এর কারণ যৌবন। যখন লক্ষ্মীকে বিয়ে করেছিলেন তখন তিনি কিশোর, ক্রীড়া আসক্তিই প্রবল ছিল। এখন রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

মুগ্ধ রাত্রি। নিমাই নির্নিমেষ চাঁদ দেখছেন। কাঁকনের শব্দ হতে মৃদুস্বরে ডাকলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় নেচে ওঠে। কী মধুর কণ্ঠস্বর। বলল—আমাকে আবার ডাকো।

নিমাই ডাকতে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিধ্বনির মত বলল—বিষ্ণুপ্রিয়া।

নিমাইয়ের অন্তর দুলে ওঠে। তিনি দুহাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নিগ্ধ মুখখানি তুলে ধরলেন। কাজল কালো চোখে এ কোন আলো ?

এ আলো অনুরাগের। প্রিয়সুখভাগিনী চোখ নিমীলিত করলে নিমাই অধরস্পর্শ করলেন।

মধুর দু'বছর কাটল দুজনের। বসন্তের পুষ্পিত দিন, বর্ষার সিক্তরাত, হেমন্তের নিস্তব্ধ দুপুর যেন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমকে বিচিত্র করার জন্য। প্রেম ভোলা যায় ?

জগন্নাথের মৃত্যুর পর তিন চার বছর গত, আর দেরী করা কর্তব্যে অবহেলা। সুতরাং নিমাই গয়াযাত্রা স্থির করলেন।

নিমাইয়ের সঙ্গে মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আর কতিপয় শিষ্য। পৌটলাপুঁটলি নিয়ে ওরা হেঁটে চলেছে। মন্দার পৌঁছতে নিমাইয়ের জ্বর। ঔষধের প্রয়োজন হল না, ব্রাহ্মণের পাদোদক খেয়েই জ্বর ছেড়ে গেল। আবার সকলে হাঁটা দিল। নিমাই কখনও অরণ্যশোভা কখনও প্রাচীন মন্দির দেখে মুগ্ধ। ভারতভূমিতে কত কিছু দেখার যে রয়েছে। যে ঘরে রইবে তার দেখা হবে না।

পিতৃকার্য শেষ হলে নিমাই লক্ষ্মীর কাজও করলেন। ওর মুখ মনের আকাশে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ফুটে রইল বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ।

নিমাই বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করছেন। তাঁর অধরোষ্ঠ কাঁপছে আর কমললোচনে বইছে বারিধারা। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখলেন সাধক ঈশ্বরপুরী। তিনি বারিধারার অর্থ বুঝলেন। এ প্রেমাশ্রু, তবে প্রেম মানবীর সঙ্গে নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে।

ঈশ্বরপুরী দেখলেন কমললোচন গৌরকান্তি যুবা বুঝি মূর্চ্ছা যায়। তিনি ঝটিতি নিমাইকে ধরলেন। নিমাই প্রণাম করলেন ঈশ্বরপুরীকে

নিমাই অতিথিশালায় ফিরে রাঁধতে বসেছেন, ঈশ্বরপুরী উপস্থিত। আহারের পর দুজনে আলোচনা হয়। পুরী বললেন—শাস্ত্রাভিমান এক ব্যাধি। কৃষ্ণের কৃপায় এ ব্যাধি থেকে বৈষ্ণব মুক্ত।

নিমাই পণ্ডিতের শ্রীবাস ও মালিনার কথা মনে পড়ল। ন্যায়ের কচকচি কবে ছাড়বে? তিনি মুখবিকৃতি করলেন। কচকচিই বটে। তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল? হাঁফিয়ে ওঠে।

বললেন—আমি মুক্তি চাই।

—উত্তম।

মহালগ্নে ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দীক্ষা দিলেন। বীজমন্ত্র: গোপীজন বল্লভায়।

নিমাই তদগতচিত্তে বীজমন্ত্র জপ করেন আর নিরালায় চুপচাপ থাকেন। বসিয়া বিরলে থাকরে একলে, না শুনে কাহারও কথা।

মেসোমশাই নিমাইকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন। লক্ষণ তো ভাল নয়। বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে বাঁচেন।

পৌষমাসে সকলে নবদ্বীপ ফিরলেন।

*

সংবাদ পেয়ে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অধীর চঞ্চল। বিষ্ণুপ্রিয়া কুলবধূ, ও আর কোথায় যাবে, প্রিয়মুখ দেখার কামনায় দরজার আড়ালে

দাঁড়িয়েছে। কতদিন হয়ে গেল, যেন শতেক বরষ পরে বঁধু আসিলেন ঘরে।

নিমাই সদর দরজায় মাকে প্রণাম করল।

বিষ্ণুপ্রিয়া দুচোখ ভরে নিমাইকে দেখছে। নয়ন না তিরপিত ভেল। দেখে কী আশা মেটে? ওগো, আমার প্রাণে তোমার স্পর্শ দাও।

নিমাই ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে জলপান করতে বসলেন। ধীর স্থির শচী বললেন—ভাল ছিলি তো?

—হাঁ মা ভালই ছিলাম। বড় আনন্দে সময় কেটেছে।

—ক্রিয়াকর্ম?

—করেছি।

নিমাই মাকে দীক্ষা নেওয়ার সংবাদও দিল।

অপরাহ্নবেলায় শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ, মুরারি গুপ্ত বাড়িতে এলেন। তীর্থকথা হতে নিমাই বললেন—একটি শিক্ষা হয়েছে আমার। যাত্রাপথে যতগুলি জনপদ দেখেছি, সবগুলিতেই নিম্নবর্ণের হিন্দুর বড় দুরবস্থা। ওরাও তো কৃষ্ণের জীব।

বলে কেঁদে ফেললেন।

চোখের জল বড় ছোঁয়াচে। বন্ধুদের চোখেও জল এসে যায়। সকলে পরামর্শ করেন, ধর্মাচরণের দ্বারা অস্পৃশ্যতার বিহিত কীভাবে করা যায়।

*

শীতের রাত। এক প্রহর যেতেই সাড়া শব্দ নাই। পুরবাসীজন লেপ কম্বলের তলায়। শুধু শ্রীবাসের বাড়িতে থেকে থেকে কীর্তনের পদ ভেসে আসে। একূলে ওকূলে, দুকূলে গোকুলে, আপন বলিব কায়।

নিমাই বিছানায় শুয়ে শুনছেন। সত্যিই তো আপন বলব কাকে? কেউ পর নয় সবাই আপনজন।

বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরপায়ে ঘরে এল। প্রিয় অনুরাগ লাগি হৃদয় কাতর।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছেন। মনের কথা কীভাবে বলবেন, বুঝতে পারছেন না। অনেক ভেবে বললেন—তোমার সব কুশল তো?

—আমার আবার কুশল কী নাথ? তোমার কুশলে আমার কুশল।

—সুন্দর! বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি সুন্দর বলেছ।

নিমাই আবার নীরব। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর পদসেবা করবে বলে পায়ে হাত দিয়েছে. নিমাই বললেন—প্রিয়া, আমার সেবার প্রয়োজন নাই। তুমি কৃষ্ণের সেবা কর।

—তুমিই আমার কৃষ্ণ।

—না। আমি কৃষ্ণের দাস।

বলে নিমাই রোদন করতে থাকেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর দুঃখ বুঝতে পারে না। কেবলই প্রশ্ন করে—কী হয়েছে তোমার?

নিমাই নিরুত্তর। দুচোখে অবিরল বারিধারা।

ভয় পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করল। শচী ত্বরায় উঠে এলেন। শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে আছেঃ বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে. কি লাগিয়া কান্দ বাপ, তোর দুঃখ কিসে?

নিমাই বললেন—মা, আমি ভালবাসার মর্ম বুঝেছি। সেই আনন্দে কাঁদছি। ভয় পেও না। যাও শুয়ে পড়।

—যাই। শচী গভীর গলায় বললেন—তুমি দেবাবিষ্ট সাধারণ নও।

শচী চলে গেলে বিষ্ণুপ্রিয়া দুয়ারে কপাট দিল। নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। এ কেমন মিলন?

শান্ত সকাল। নিমাই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ি এসেছেন। শ্রীমান পণ্ডিত, মুরারি গুপ্তও এসেছেন। এখানে বসেই কর্মপন্থার আলোচনা হবে।

সহসা নিমাই মূর্চ্ছা গেলেন। দু তিন বছর বেশ ছিলেন, এখন আবার পূর্বাবস্থা। হয়ত পূর্বের চেয়েও মন্দ।

সকাল থেকে দুপুর নিমাই অচেতন। চক্ষু স্থির, মুখ থেকে লালা গড়ায়। বিকেল হতে চৈতন্য ফিরে এল। তখন তিনি যাকে সামনে পান তাকেই আলিঙ্গন করেন— তুমি আমার কৃষ্ণ। সখাদের বললেন —এই আমার কর্মপন্থা।

সন্ধ্যায় নিমাই বাড়ি ফিরলেন। অস্বাভাবিক অবস্থা। শচীমাতা স্নান করিয়ে খাইয়ে দিলেন। শয়ন করলে বিষ্ণুপ্রিয়া পায়ের কাছে বসে থাকে।

বধূ ভেবে পায় না, কেন এমন হল। মন উচাটন, নিঃশ্বাস সঘন, কোথা বা কী দেব পাইল।

নিমাইয়েরও মন উচাটন। প্রিয়া, আমি তোমাকে কেমন করে ভুলব?

*

নিমাই পণ্ডিত আবার টোল খুললেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে আশাপাখি ওড়াওড়ি করে। কাজের মধ্যে না থাকলে এলোমেলো চিন্তা এসেই যায়। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হল না। নিমাই ন্যায়ের পাঠ দেন না। বলেন, অনুমানে প্রমাণ হয় না। অনুমানের প্রয়োজনই বা কী? প্রত্যক্ষ সত্য রয়েছে। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই। মানুষকে ভালবাসার পাঠ নাও। পড়ুয়াগণ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। টোল উঠে গেল।

নিমাই হাততালি দিয়ে গাইছেন: হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। শিষ্যগণও গাইছে। নামগানে আসর মুখর। পথচারী থমকে দাঁড়ালে নিমাই বসতে ইঙ্গিত করেন। বাছ বিচার নাই। যে নামগান করে সেই ভক্ত। যে ভক্ত সেই ভগবান্।

নবদ্বীপ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

শচী বিপন্ন বোধ করেন। এমন করলে সংসার কিরূপে চলে? বিষ্ণুপ্রিয়ার কি গতি হবে? দেবাবিষ্ট পুত্রের কেন তিনি বিয়ে দিলেন? নিমাই মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বাড়ি এলে তিনি বললেন—তুই টোলে বসবি না?

—না।

—সংসার কী ভাবে চলবে?

—কেন, শিষ্যেরা রয়েছে।

—আর তুই?

—আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বৈষ্ণব আখড়ায় চলে যাই।

শচী বিচলিত হলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও স্থির রইল না। তাই বলে এখনই ভরসা ছাড়ল না নিমাইয়ের উপর। শচী বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধেন, বিষ্ণুপ্রিয়া যত্ন করে পরিবেশন করে। নিমাই প্রেমভাবে উদাসীন। গোবিন্দ দাসের পদ এই রকম- নীরদ নয়নে, নীর ঘন সিঞ্চনে, পুলক মুকুল অবলম্ব। স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত, বিকশিত ভাব-কদম্ব।

পদকর্তা কী বলতে চাইছেন?

নিমাইয়ের দেহে রোমাঞ্চরূপ মুকুল আর চোখ দুটি যেন নীরদ। তার থেকে অবিরল জল পড়ছে। প্রেমভাবে উদাসীন নিমাইয়ের কদম্বতরুর সঙ্গে তুলনা। অবিরল চোখের জলে এই তরু বর্ষণসিক্ত কদম্বতরুর ন্যায়।

নিমাই নিমিত্তমাত্র বাড়িতে থাকেন। ঘর করেছেন বাহির তিনি। বাইরে বাইরেই দিন কেটে যায়, রাত্রির দুই এক প্রহরও কাটে। আজ গভীর রাতে কড়া নাড়লে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—তুমি আমাকে আর ভালবাস না।

—মিথ্যা কথা। তোমাকে আগের মতই ভালবাসি।

—তবে তুমি এত রাত্রে বাড়ি ফের কেন?

—কীর্তন যে রাত্রি করেই শেষ হয়।

—কী ছার কীর্তন! বিষ্ণুপ্রিয়া অভিমান করল—আমি এখানে কেঁদে মরি আর তুমি কীর্তন কর।

রাধামোহন দাসের পদ আছে : মাধব, কাহে কান্দাওলি হাসে! চল চল সো ধনি-ঠাসে।

রাধা অভিমানে বলছে : আমাকে বৃথা কাঁদাও কেন? যে রমণীর কাছে এত রাত পর্যন্ত ছিলে সেখানেই যাও।

নিমাই কোন নারীর প্রেমে পাগল নয়। এ অন্য প্রেম।

সকালে শচীমাতা ধরলেন—তোর কী হয়েছে বল দেখি? অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়লি। ঘরে থাকিস না। অমন সুন্দর বউ তার কথা ভাবিস না।

নিমাই নিরুত্তর। তিনি সকলের কথাই ভাবেন। ভেবে ভেবে পাগল।

*

শ্রীবাস নিমাইকে দেখতে বাড়ি এসেছেন। কারণ, লোকে নানা কথা বলেছে। কেউ বলছে বায়ু রোগ, কেউ বলছে মৃগী রোগ। দু' একজন উন্মাদও বলছে।

নিমাই শ্রীবাসের মুখের দিকে তাকালেন—শ্রীবাস আমার কী হয়েছে? কেন আমি অহর্নিশ কাঁদি? কেন আমার প্রাণ দগ্ধ হয়? কেন আমি মূর্চ্ছা যাই? এ কোন ব্যাধি?

—ব্যাধি নয়।

—তবে কী?

—মহাভাব।

—সে কেমন?

—কৃষ্ণ যারে মহাভাব দেন তার নিত্য দগ্ধ করে প্রাণ। যতক্ষণ না সে নিজেকে প্রকাশ করছে ততক্ষণ তার শান্তি নাই।

নিমাই ব্যগ্রতায় শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করলেন। বুঝেছে, শ্রীবাস বুঝেছে।

বসন্ত ঋতু। শ্রীবাসের উদ্যানে অশোক কাঞ্চন ইত্যাদি বিবিধ পুষ্প বিকশিত। চম্পক বৃক্ষের ডালে কোকিল পঞ্চমে গাইছে।

নিমাই বৃক্ষতলে দাঁড়ালেন : কী সুন্দর এই স্থান, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বেশ সহজভাবেই ডাকলেন—মালিনী।

—যাই। মালিনী বেরিয়ে এল—কিছু বলবে ?

—শ্রীবাস বলল, প্রকাশ না করলে আমার শান্তি নাই। কী ভাবে প্রকাশ করব ? আমি তো কবি নই যে কাব্য লিখব, শিল্পী নই যে পট আঁকব, সঙ্গীতজ্ঞ নই যে গান গাইব। আমি কী করব মালিনী?

—প্রেমধর্ম প্রচার কর। জগৎকে দেখাও প্রেমের মহিমা। যজন যাজন নয়, বাছবিচার নয়, শুধু নাম কীর্তন, যা সবাই পারে। আর মানুষকে ঘৃণা নয়, ভালবাসা।

—বেশ। তোমার বাড়িতেই নাম কীর্তনের আয়োজন কর।

মালিনী তো এই চায়, কোমর বেঁধে কাজে লাগল।

শ্রীবাসের বাড়ির উঠোনে কীর্তনের জমজমাট আসর। নবশাখ নমঃশূদ্র কেউ বাদ যায় নাই। নিমাই বলেছেন, সবাই মানুষ, সবাই সমান।

কয়েক শত লোক খোল করতাল বাজিয়ে নাচছে, গাইছে। সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত নাচ গান। সুরের না তালের ভুল বলে কিছু নাই। নিমাই বলেছেন, আনন্দই সব।

নিমাই দু' বাহু তুলে নাচছেন আর বলছেন, হরিবোল হরিবোল। যেমন সবাই বলছে তেমনি। গোরা রায় নাচে হরিবোলে, দুটি বাহু তুলে।

রমণীগণ উলু দিচ্ছে শাঁখ বাজাচ্ছে। আবার মালিনীর দেখাদেখি কোমর দুলিয়ে নাচছে।

সারারাত কীর্তন। কী আনন্দ, কী আনন্দ। আনন্দে নরনারী গড়াগড়ি যায়।

গোল বাধল।

নবদ্বীপের মেলালোক শ্রীবাসের বাড়ির সামনে উপস্থিত। কতিপয় ব্যক্তি বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করছে—দরজা খোল। আমরা দেখব, তোমরা কী করছ, কেমন তোমাদের নাম কীর্তন।

শ্রীবাস দুয়ার খুললেন। কিছু লোক ভেতরে এল, কিছু এল না। যারা এল না, তাদের একজন বলল—যত সব ইতর শ্রেণীর মেয়ে মরদ নিয়ে সারারাত চেঁচামেচি। এ আবার কী?

—এর নাম সংকীর্তন।

—তা একটু নিম্নস্বরে করলে হয় না?

—হয়। তবে দল বল তো কম নয়, আর খেটে খাওয়া মানুষের কণ্ঠস্বর কিছু তেজী।

—তেজী চলবে না। আমরা কাজীর কাছে নালিশ করব।

নিমাই এগিয়ে এলেন—কেন নালিশ করবেন? আমরা তো কারও কোন ক্ষতি করি না।

—অবশ্য করেন। এক বিজ্ঞ ব্যক্তি চোখ পাকালেন—নিমাই পণ্ডিত, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েও এমন অর্বাচীন। আপনার প্রেমধর্ম বিপ্লব আনবে, বুঝতে পারছেন না?

—পারছি।

বলে নিমাই হাসলেন।

•

শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব। বিষ্ণুর এক অবতার নৃসিংহ, তাঁর নিত্য পূজা করেন। ঠাকুর ঘরে শালগ্রামশিলাও আছে।

নিমাই ঠাকুর ঘরে ঢুকে শালগ্রামশিলার পাশে বসে পড়লেন। শ্রীবাস বাক্যহারা। কোন প্রতিবাদ করলেন না। করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, নিমাই মানুষ নয়, দেবতা।

মালিনী একটু অন্যরকম বিবেচনা করল। সবার ওপর যখন মানুষ সত্য, তখন আর দোষটা কোথায়? নিমাই ঠিকই করেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা দুই প্রহর। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পিঁড়ি পেতে নিমাইকে বসান হয়েছে। রমণীগণ তাঁর মাথায় জল ঢালে। অভিষেকের পর মালিনী তাঁর গা মুছিয়ে দিল।

নিমাই আবার বিষ্ণুখট্টায় বসলেন। মালিনী শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করল, মাথার চুল চূড়া বেঁধে দিল, গলায় মালা দিল।

ভক্তগণ করজোড়ে স্তব করে— হে গৌরহরি, তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমরা তোমার শরণ নিলাম।

গৌরহরি বললেন—উত্তম। আমি তোমাদের রক্ষা করব। কোন শক্তিতে জান? প্রেম। সবল রাজাও তোমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না।

মালিনী বারংবার ঠাকুর ঘরে যাচ্ছে আসছে, কিন্তু নবশাখ ও শূদ্র রমণীগণ বাইরে, তারা গৌরহরির দর্শন পায় নাই। এক ভক্তিমতী অত্যন্ত কাতর হয়ে মালিনীকে দর্শন প্রার্থনা জানাল। শুনতে পেয়ে গৌরহরি বললেন—আপনারা স্বচ্ছন্দে ঠাকুরঘরে আসতে পারেন।

জনতা জয়ধ্বনি করল।

*

বর্ধমানের নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী প্রেমধর্মের সংবাদ পেয়ে নবদ্বীপ এসেছে। বিশালকায় পুরুষ, পরিধানে নীলবস্ত্র। তিনি নিমাইকে খুঁজছেন। নিমাই পণ্ডিতের কোন বাড়ি তোরা বল।

লোকে বলল, নিমাই নন্দন আচার্যের বাড়িতে রয়েছে। নিতাই সেখানেই গেল।

সপার্ষদ নিমাই যেন তাঁরই অপেক্ষা করছিলেন। আলাপ পরিচয় হলে নিমাই বললেন—দণ্ড কমণ্ডলুর কিবা প্রয়োজন?

—কিছুমাত্র না।

বলে নিতাই দণ্ড কমণ্ডলু ভেঙ্গে ফেললেন।

নিমাই নিতাইকে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

—মা, দেখ তোমার বড় ছেলে এসেছে।

—বিশ্বরূপ ?

—আকারে নয় অন্তরে। নিতাইকে তুমি পুত্রজ্ঞানে স্নেহ কর।

—আয় বাপ।

বলে শচী নিতাইকে কোলে নিলেন। নিমাই মুগ্ধ চোখে ওদের দেখছেন। প্রেমের কি মহিমা! পরকে অনায়াসে আপন করে!

•

শ্রীবাসের বাড়িতে গৌরহরি সপার্ষদ প্রেমধর্ম আলোচনা করছেন. তাঁকে সামান্য চিন্তিত দেখায়। সহসা বললেন—শ্রীবাস, শান্তিপুরে লোক পাঠাও, অদ্বৈতাচার্যকে আমার প্রয়োজন। সে প্রেমধর্ম প্রচার করবে।

ভাল কথা। শ্রীবাসের ভাইপো শান্তিপুর গেল।

অদ্বৈতাচার্য স্ত্রী সীতাকে নিয়ে গৌরহরির কাছে এলেন। আলাপ হতে তাঁদের হৃদয় এমন পরিবর্তিত হল যে, কোন রকম তর্ক করলেন না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সর্বান্তঃকরণে প্রেমধর্ম মেনে নিলেন।

মালিনী সীতাকে বলল—নিমাই নূতন এক ধর্ম আনছে।

—ওঁর কথা শুনে তাই মনে হল।

—তোমার ভাল লেগেছে ?

—খুব। শনি পূজো মাকাল পূজো, অর্থহীন নয় ?

—আর ছোঁয়াছুঁয়ির বাচ বিচার ?

—ঘোর অন্যায়। ঘেন্না ধরে গেল

দুই অনুরাগিণী ভাবছে প্রেমধর্মের কথা।

গৌরহরি অদ্বৈতকে বললেন, একবার নাচ দেখি। অদ্বৈত দুহাত তুলে নাচতে লাগলেন। কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নাই, লাজলজ্জা নাই।

নিমাই হাসলেন—এ যে দেখি খেটে খাওয়া মানুষের মত নাচে।

—আমি তাই।

—সাধু, সাধু।

বলে নিমাই তালি দেন। আর অদ্বৈতাচার্য মনের আনন্দে নাচেন।

কিছুদিন পর। গৌরহরি আবার শ্রীবাসকে আদেশ করলেন—চট্টগ্রামে লোক পাঠাও। পুণ্ডরীককে আমার প্রয়োজন।

এবার আর কাউকে যেতে হল না, পুণ্ডরীক নিজেই চলে এসেছে, সঙ্গে বহু লোকজন। তিনি গৌরহরির মহাভক্ত গদাধরের নিকট গেলেন।

গদাধর গৌরহরিকে সংবাদ দিলে তিনি বিদ্যানিধিকে আদেশ করলেন—পুণ্ডরীককে দীক্ষা দাও। সে প্রেমভক্তি প্রচার করবে।

মহাপ্রভু ধর্মপ্রচারে নামলেন। তাঁর সহায় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য দুই প্রভু। আর গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, স্বরূপ দামোদর ইত্যাদি আটজন পার্ষদ। যবন হরিদাসও মহাপ্রভুর শরণাগত।

কাজী মুলুকপতি হরিদাসকে ধরে নিয়ে গেলেন। তাঁর মন্ত্রী গোরাই কাজী বললেন—হরিনাম ছাড়। কলমা পড়।

হরিদাস হরিনাম ছাড়লেন না। চৈতন্য ভাগবতে আছে: খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় দেহ প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।

কাজীর অনুচররা হরিদাসের উপর শত নির্যাতন করল। তিনি নির্বিকার। তাঁর মনে হিংসা নাই। শেষমেষ অনুচরগণ হরিদাসকে মুক্তি দিল।

মুক্তি পেয়ে হরিদাস মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছেন। অতি দীন ভাব। একান্ত সঙ্কোচ করে, একধারে আছে সরে।

মহাপ্রভু বললেন—হরিদাস, তুমি আমার সহায় হও।

*

নিমাই ঈশ্বরাবেশে মহাপ্রভু। এই আবেশ মানুষের অপার মহিমা দেখানোর জন্য। মানুষই ঈশ্বর। অহংকারে নয়, প্রেমে। যখন তিনি দেবাবিষ্ট, তখন ভক্তগণের শত আবদার সহ্য করেন। চৈতন্যভাগবতে

আছে : কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিল। গৌরচন্দ্র, কেমন খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ। যে যা দিচ্ছে নিমাই খাচ্ছেন।

মহাপ্রকাশের দিন। নিমাই বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করেছেন। অভিষেক ও রাজবেশের পর ভক্তরা স্তব করছেন। শচীমাতাও। পদকর্তার বর্ণনা এইরকম : তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে, শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে। পঞ্চদীপ জ্বালি তিঁহ আরতি করিল, নির্মঞ্ছন করি শিরে ধান দূর্বা দিল :

এ কেমন হল? এ হল, দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

নিমাইয়ের কাছে সর্বক্ষণ আসছে নিত্য নূতন ভক্ত। আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে রতন হইল কতজনা। তিনি পূর্বে প্রেম ধর্ম সাধনায় মত্ত রয়েছিলেন বলে বিষ্ণুপ্রিয়া মান করেছিল এখন প্রেমরসের অনুরাগীদের নিয়ে মত্ত বলে বিষ্ণুপ্রিয়া মান করেছে।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার মান ভাঙতে একথা সেকথা বলছেন, নিতাই উপস্থিত। কথা নাই বার্তা নাই, উনি কৌপীন খুলে মাথায় বাঁধলেন। তারপর হনুমানের মত সমস্ত উঠোন দাপিয়ে বেড়ান। কী ব্যাপার?

ন্যাংটো নিতাই জোড়হাতে নিবেদন করেন—আপনাদের দুজনকে দেখে মনে হল রামসীতা। তাই হনুমান সাজলাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না এক ফাঁকে পালিয়ে বাঁচল। নিমাই বললেন —নিতাই ভক্তদের জগাই মাধাই বড় ভোগাচ্ছে।

*

নদীয়ার কর্তা হল জগাই মাধাই। পুরবাসীজন ওদের ভয় করে এবং ভয়ে সবরকম অত্যাচার সহ্য করে।

নিমাই ভক্তদের প্রশ্ন করলেন—কেন তোমরা জগাই মাধাইকে ভয় কর?

—ওরা দু' ভাই অতিশয় বলবান। মারধোর করলে আমরা পেরে উঠব না।

—সকলের এই মত?

—না। নিতাই উঠে দাঁড়ালেন—অনুমতি পেলে আমি জগাই মাধাইয়ের কাছে যাই।

নিমাই চিন্তা করে বললেন—সকল ভক্তকে ডাক। আমরা কীর্তন করতে করতে জগাই মাধাইয়ের বাড়ি যাব। আজ প্রেমধর্মের পরীক্ষা।

সন্ধ্যাবেলা গৌরহরি সদলে নেচে নেচে চলেছেন। পায়ের নূপুর মধুবোলে বাজে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনা এইরকম: সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভু যায়, নদীয়ার সবলোক দেখিবারে পায়।

সবলোক আজ প্রেমধর্মের পরীক্ষা দেখবে।

নিতাই সবার আগে। তাই ওঁর উপরই জগাই মাধাইএর নজর। মাধাই বেশী হিংস্র, সে ভাঙা কলসীর কানা ছুঁড়ে মারল। নিতাইয়ের মাথা ফেটে রক্তের ধারা বয়ে যায়। তখন নিতাই কী করল? পদকর্তা বলছেন: মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি, তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।

মাধাই আবার কলসীর কানা ছুঁড়তে উদ্যত, জগাই ওর হাত চেপে ধরল—করিস কী?

মাধাই নিরস্ত হল।

নিতাই জগাইকে আলিঙ্গন করলেন—বন্ধু তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তুমি আমার সুহৃৎ তুমি আমার সঙ্গে নাম বলবে না?

জগাই বলল—হরি বোল। বলে মাধাইয়ের দিকে তাকাল—তুইও বল। সেও বলল।

হরিধ্বনিতে নবদ্বীপ ডুবে যায়।

*

নিমাই ভেবে দেখলেন, লোকরঞ্জনের জন্য হরিনাম যথেষ্ট নয়। কৃষ্ণলীলা অভিনয় করলে রঞ্জনও হবে শিক্ষাও হবে।...চন্দ্রশেখরের আঙিনায় আসর বসল। শ্রীবাস কৃষ্ণ সাজলেন, নিমাই রাধা।

অপরূপ। হেন রূপ কবহুঁ না দেখি। যে অঙ্গে নয়ন যুই, সেই অঙ্গ হতে মুঞি ফিরাইয়া লৈতে নারি আঁখি।

শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে এসেছেন। মালিনীও এসেছে। ও ইতি উতি চায়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন, নিমাইয়ের কাছে যাওয়া হল না।

অভিনয় চলছে।

গোপীবেশে ঠাকুর আপনি। রাধা বলছেঃ কৃষ্ণ, তুমি যদি আমাদের কথা না শোন তাহলে যতেক গোপিনী পথের ধুলায় পড়ে থাকব। তুমি আমাদের বুকের ওপর দিয়ে রথ চালাতে পারবে?

—না। এত ক্ষমতা আমার নাই।

—তাহলে রথ থেকে নেমে এস।

জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। চৈতন্য ভাগবতে আছেঃ আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে, হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে।

অভিনয় শেষ হতে নিশি ভোর।

পুনরপি গৌরহরি চিন্তিত। তিনি যে এভাবে প্রেমধর্ম প্রচার করতে পারবেন মনে হয় না। তিনি গৃহী এবং গৃহে যুবতী স্ত্রী। তাঁর প্রেম কার জন্য বেশী? লোকে অবশ্যই ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার। যে একের সঙ্গে প্রেম করে, সে বহুর সঙ্গে কী ভাবে প্রেম করবে?

নিমাই চিন্তাভাবনায় এমনই কাতর যে, রোদন করছেন। এমন সময় কেশব ভারতী উপস্থিত। বললেন—নিমাই, কাঁদ কেন?

—দুঃখে।

—দুঃখে নয়, ভয়ে। ভয় ছাড়া দুঃখ তো সুখ।

—যথার্থ। নিমাই আবেগের গলায় বললেন—আমি সংসার ত্যাগ করতে ভয় পাই। তাই লোকে হাসে। শচীর ছেলে গৌরহরি? বড়ই রঙ্গের গৌরহরি। দিব্য রাজভোগ খাচ্ছে, মাগ কোলে শুচ্ছে। মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল। বোল হরিবোল।

কেশব ভারতী হাসলেন না। এ সবই তিনি শুনেছেন নবদ্বীপে এসে। বললেন—সন্ন্যাসীরই ধর্মপ্রচারে অধিকার।

—তাহলে আমি সন্ন্যাস নেব। নিমাই মুখ খুললেন।

এ কথা শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং পার্ষদগণ শুনল। নিতাই বললেন—এমন নিষ্ঠুর হয়ো না। মা-র ও স্ত্রীর কথা ভাব।

—ভেবেছি! অনেক ভেবেছি নিত্যানন্দ। ওদের কথা ভেবে মনেপ্রাণে সন্ন্যাসী হয়েও গৃহে ছিলাম। তা হল না। যেতেই হবে। তবে এখনই না। এখনও সময় হয় নাই।

নিমাই সঙ্কল্পে অটল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পাগলিনীপ্রায় অবস্থা। বাসুদেবের বর্ণনা এইরকম। পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে, ত্বরা করি বাড়ি আসি শ্বাশুড়ীরে বলে। বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর, শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর।

কি লাগি কাতর? বিষ্ণুপ্রিয়া বলে—আর কি কব জননী, চারিদিকে অমঙ্গল, কাঁপিছে পরাণী। নাইতে পড়িল জলে নাকের বেশর, ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় বজ্র পড়বে। এই নব যৌবনে প্রিয়তম হবে সন্ন্যাসী। হায়।

এক প্রহর রাত্রে নিমাই খেয়ে উঠলেন। শচীমাতা আজ লাউয়ের পায়েস রেঁধেছিলেন। খাওয়া একটু বেশীই হল। নিমাই শয়নকক্ষে পায়চারি করলেন, তারপর গা এলিয়ে দিলন বিছানায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া পানের বাটা নিয়ে ঘরে এসে দেখল স্বামী ঘুমোচ্ছে। বধূ পায়ের কাছে চুপ করে বসে রইল।

নিমাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলল—তুমি নাকি আমাকে, না আমাদের, অকূলে ভাসাবে?

নিমাই অকূলে ভাসানোর অর্থ বুঝেছেন, তবু বললেন—অকূলে ভাসানোর অর্থ কী?

বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্ন্যাস মুখে আনার ইচ্ছা নাই, বলল—তোমার দাদা যা করেছে তুমিও তাই করবে ?

—পাগল।

বলে নিমাই হাসলেন। তিনি সোজাসুজি উত্তর দিতে পারলেন না। না পেরে প্রিয়াকে সোহাগ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আর বালিকা নয়। বুঝেছে, এ ছল। চৈতন্যমঙ্গলে আছে ঃ প্রভুর কর বুক নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, মিছা না বলিহ মোর ডরে। হেন অনুমান করি, যত কহ সে চাতুরী, পলাইবে মোর অগোচরে।

নিমাইয়ের বুক ব্যথায় টনটন করে উঠল। প্রেমধর্মের উদ্গাতা হয়ে এখন অপ্রেমের কাজ করবেন কী করে ? অনেক ভেবে বললেন—প্রিয়ে, তুমিতো আমার ভাল চাও। চাও না ?

—চাই।

—তাহলে আমার সহায় হও।

—হব। তুমি অরণ্যে প্রান্তরে যেখানে আমাকে নিয়ে যাবে আমি যাব। তুমি ভিক্ষা করলে আমি ভিক্ষা করব। তুমি তরুতলে বাস করলে আমিও তরুতলে বাস করব।

—সন্ন্যাসীর সস্ত্রীক থাকা চলে না।

—বেশ। আমি বাপের বাড়ি যাচ্ছি। তুমি মার কাছে থাক।

—সন্ন্যাসীর গৃহে থাকাও চলে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর কিছু বলল না। কাঁদতে লাগল। নিমাই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। সারারাত ঘুমোতে পারলেন না।

কাকভোরে নিমাই শ্রীবাসের বাড়ি গেলেন।

শীতকাল। গৃহস্থেরা অতিসুখে নিদ্রা যায়। আহার মৈথুন নিদ্রা হল জীবধর্ম কিন্তু সব জীব এক নয়।

মালিনীর স্নান সারা। গানের গলায় গুনগুণ করছে—সখি, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তারি ঠাঁই।

শুনে নিমাইয়ের চোখের মণি নড়ল। ঠিক, গার্হস্থ্য প্রেমে যে সুখ সে কদিনের আর কীই বা সুখ। দুঃখ এসেই যায়।

নিমাইকে দেখে মালিনী গানের পদ বদলাল—প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু দিন যাবে ভাল।

—মুখ ভাল করে দেখে নাও। নিমাই মাথার চুল মুঠি করে ধরল। —এই চাঁচর চিকুর বেশ থাকবে না। মুণ্ডিত মস্তক।

—আঁা! তুমি কী শুকনো সন্ন্যাসী হবে নাকি?

—তা হব না। তবে সন্ন্যাসীর আচরণ তো পালন করতে হবে।

—বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হবে কেন?

—ধর্মপ্রচারক মাত্রই সন্ন্যাসী।

—প্রেমধর্ম প্রচারক সন্ন্যাসী নয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস মহাজনেরা কী সন্ন্যাসী?

দুজনই চুপ। বেশ কিছুক্ষণ পর মালিনী গুণ গুণ করে বলল, পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়?

—মালিনী, আমার আপন পর নাই। সবাই আমার আপন।

মালিনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিমাই অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—মাকে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমি যথাসাধ্য বুঝিয়েছি। তুমি ওদের দেখ।

*

অদ্য শেষ রজনী। ভক্তদের বুঝিয়ে দুপুররাতে নিমাই বাড়ি ফিরলেন। শচী হেঁসেল আগলে বসেছিলেন, নিমাই হাত মুখ ধুতে ভাত বেড়ে দিলেন। মাকে খুশী করতে নিমাই খেলেন চেটেপুটে। গৃহত্যাগের কথা একটিও বললেন না। মা তো মনোসুখে অনুমতি দিয়েছে, তবে আর দুঃখ বাড়ানো কেন?

নিমাই বিছানায় বসে আছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতীক্ষায়। আজ

আর গৃহত্যাগের কথা নয়। তাহলে কী? পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে, মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে। বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।

নিমাই মৃদু হেসে বললেন—প্রিয়ে, আজ আমি তোমাকে সাজাব! তুমি আমার অঙ্গ বেদিতে বস। আমি তোমাকে সিন্দূরে চন্দনে সাজাব।

—বেশ। তার আগে তোমাকে আমি সাজাই।

বলে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের মুখে অলকা তিলকা আঁকল, চোখে কাজল দিল, মালতীর মালা দিল গলায়। একি! এ যে কুলনারীর মত দেখায়। ঘন গঞ্জন চিকুর-পুঞ্জ, মালতী-ফুল মাল রঞ্জ, অঞ্জন যুত কঞ্জানয়নী খঞ্জন-গতি-হারী!

বিষ্ণুপ্রিয়া সতৃষ্ণনয়নে প্রিয়ের রূপ দেখছেন। বুক জুড়ে তৃষ্ণা।

এবার নিমাই প্রিয়াকে সাজাবেন। উনি কপালে সিঁদুরের টিপ দিলেন, টিপের চারপাশে চন্দনের বিন্দু। আহা। চাঁদবদনী ধনি প্রিয়া মৃগনয়নী।

নিমাই মুগ্ধনয়নে প্রিয়ার রূপ দেখছে। দুজনে দুজনের রূপ দেখছে। দেখে আশা মিটছে না।

এরপর প্রিয়া প্রিয়ের আলিঙ্গনে। গৌর প্রেমে গরবিনী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরবক্ষ বিলাসিনী দেহ পদচ্ছায়া। বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে নিদ্রা যায়।

রজনী শেষ না হতে নিমাই উঠলেন। প্রিয়ার এক পা তাঁর পায়ের ওপর, সেটি নামালেন অতি সন্তর্পণে। প্রিয়ার অধরে অধর স্পর্শ করলেন। তাঁর কপোলতলে একবিন্দু নয়নের জল।

নিমাই ঘর ও ঘরণী ত্যাগ করলেন।

[তিন]

ভারতী নিমাইয়ের কানে সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়ে বললেন—শ্রীচৈতন্য, তুমি সকল জীবের চৈতন্য করাও। প্রেমধর্মের দ্বারা তাদের মুক্ত কর। ভয়, ঘৃণা ও সংস্কার মুক্ত। তোমার কল্যাণ হোক।

শ্রীচৈতন্য দণ্ড কমণ্ডলু হাতে বৃন্দাবন চলেছেন। নবীন যৌবন গলিত কাঞ্চন কটি বেড়া রাঙ্গা বাস, সন্ন্যাস করিয়া করঙ্গ বাঁধিয়া ধায় গোরা উর্ধশ্বাস। তাঁর বাহ্যজ্ঞান নাই, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে চলেছেন।

বৃন্দাবন আর কতদূর? নিম্নস্বরে ভক্তেরা বলাবলি করছে! শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের দিকে তাকান—ঠিক পথে চলেছি তো?

- হাঁ প্রভু। বৃন্দাবন আর একদিনের পথ।

—সেকি?

শ্রীচৈতন্য প্রত্যয় গেলেন না। বললেন—তুমি আমাকে শান্তিপুরে নিয়ে এসেছ।

যথার্থই তাই। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে তুললেন।

সীতাদেবী বিবিধ ব্যঞ্জন পরিবেশন করছেন। শ্রীচৈতন্য একটু একটু খাচ্ছেন আর বলছেন—আমি সন্ন্যাসী, আমার আহারে বিলাসিতা শোভা পায় না।

—হয়েছে। সীতাদেবী মাথা নাড়লেন—আর একটু খাও।

শ্রীচৈতন্য খাচ্ছেন আর ভাবছেন। আহা! মায়ের জাত এরা।

ভোজনের পর মহাপ্রভু শয়ন করলেন। আচার্য ও আচার্যপত্নী তাঁকে কীর্তন শোনান: কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর, চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।

স্বামী স্ত্রীর আনন্দের ওর নাই। অসীম আনন্দ।

কিছুক্ষণ পর মূঢ় ম্লানমুখ জনগণ আসতে লাগল। দলে দলে। সমবেত জনতাকে দেখবার জন্য শ্রীচৈতন্য ছাতে উঠলেন এবং সেখান থেকেই বললেন—আমি তোমাদের সার কথা বলছি শোন। মানুষে মানুষে ভেদ নাই। সকলেই কৃষ্ণনাম নিতে পারে। আর যেই নাম ভজে সেই ব্রাহ্মণ। চণ্ডালঃ অপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।

*

শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ দশ মাইল পথ। নিত্যানন্দ দ্রুত হাঁটছেন। আর ভাবছেন শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া বেঁচে আছে তো?

সকাল বেলা। শচীমাতাকে মালিনী শান্ত করার অশেষ চেষ্টা করছে —সন্তানের কল্যাণেই মায়ের কল্যাণ। দিন রাত চোখের জল ফেলে কেন তার অকল্যণ করছ? কেন অন্নজল ত্যাগ? ব্যাকুলা মালিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে গেল—বউ, কিছু মুখে দাও।

হেনকালে নিত্যনন্দ এলেন এবং সংবাদ দিলেন। তখন শচী বলছেন: হেদে গো মালিনী সই অদ্বৈত মন্দিরে চল যাই। নিমাই আইল তথা কহিল নিতাই।

যে কথা সেই কাজ। এতবলি শচীমাতা কাতর হইয়া, শান্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া।

আর বিষ্ণুপ্রিয়া? বউ শ্বাশুড়ীর আঁচল ধরল। ও-ও যাবে। তখন নিত্যনন্দ বললেন—শ্রীমতীকে নিয়ে যাওয়ার আজ্ঞা নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া নির্বাক। কোন অপরাধ কৈনু মুই অভাগিনী, দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী।

শচী নিতাইকে বললেন—বউ না গেলে আমি যাব না।

বিষ্ণুপ্রিয়া অবোধ নয়, সবই বুঝল। বুঝে বলল—মা, আপনি যান। আপনি গেলে আমি সুখী হব।

শচী শান্তিপুর চললেন দোলায় চড়ে। জনতা হরিধ্বনি দেয়। আর বিষ্ণুপ্রিয়া? কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া।

দোলা আচার্যের আঙ্গিনায় থামল। শচীমাতা নামলেন। শ্রীচৈতন্য বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মাতা ও পুত্র মুখোমুখি।

সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কাউকে প্রণাম করা অনাচার। শ্রীচৈতন্য সংস্কারমুক্ত। তিনি জননীকে প্রণিপাত করলেন।

—মা, তুমিই আমার গুরু। তোমার কাছেই আমি প্রেমধর্ম শিখেছি। সেই শিক্ষাই জীবকে দেব। বলব, মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে তেমনি ভালবাসতে হবে।

শচী শ্রীচৈতন্যের মস্তক চুম্বন করলেন। তারপর বলছেন : অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ?

মহাপ্রভু বাক্যহারা। তিনি অনেকবার নিজেকে বলেছেন : আমি সংস্কারমুক্ত, আমি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী নই, আমি প্রেমধর্ম প্রচারক, আমি প্রেমের মধুরভাবে বিশ্বাসী। তবু বাক্যহারা। হায়।

*

দিন যায়।

শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া খেতে হয় তাই খায়, শুতে হয় তাই শোয়। কাল রাতে বৃদ্ধা স্বপ্ন দেখেছেন। কালিকার স্বপনকথা শুনলো মালিনী সই, নিমাই আসিয়াছিল ঘরে'

বিষ্ণুপ্রিয়া এ স্বপ্নও দেখতে পায় না। যে বাড়িতে বউ রয়েছে সে বাড়িতে সন্ন্যাসী স্বামীর স্বপ্নে আসাও অসম্ভব। হতভাগিনী দিবানিশি পিয়ে শুধু গৌর নাম সুধাখানি।

বিষ্ণুপ্রিয়া শ্বাশুড়ীকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে চলেছে। গৌরনাম শুনে চকিত হরিণীর ন্যায় তাকাল। সব মাথা ছাড়িয়ে ও কার মাথা ?

বলছে : ঐ যে দেখা যায় দীঘল শ্রীঅঙ্গ, ঐ তো আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ। সোনার অঙ্গে কৌপীন পরেছে, চিরদিন দুঃখ অবধি পেয়েছে। আমার মায়ায় আবার আসিছে, বাড়ি ডেকে আন।

আজ নয়, শ্রীচৈতন্য একদিন বাড়ি আসবেন। জননীর মায়ায়, জায়ার মায়ায়। সে সুদিন অনেক দূর।

জায়ার মায়া কীরকম? সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। যখন প্রিয়তমের রূপলাবণ্য দেখে সঙ্গলাভে ইচ্ছা তখন সাধারণী। যখন গুণাদি শ্রবণে পরিণয় বন্ধনের ইচ্ছা তখন সমঞ্জসা। যখন প্রিয়তমের প্রীতি সুখই একমাত্র ইচ্ছা তখন সমর্থা। বিষ্ণুপ্রিয়ার যখন সমর্থা ভাব হবে, শ্রীচৈতন্য দেখা দেবেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়ন সফল হবে দেখি চাঁদমুখ।

সে সুদিন অনেক দূর হলেও আসবে।

*

নীলাচলে মহাপ্রভু। জগন্নাথ ধামে বাস করে প্রেমধর্ম প্রচার করবেন মনস্থ করেছেন। ধর্মের নামে ব্যবসা চলতে দেবেন না।

এই স্থান নবদ্বীপ থেকে মাত্র কুড়িদিনের পথ। এবং পথ বারাণসীর তুলনায় অনেক নিরাপদ। ভক্তগণ নবদ্বীপ থেকে আসবে, যাবে। ধর্ম-প্রচার ভালই হবে।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর গণের জন্য বাসুদেব সার্বভৌম মাসীর বাড়িতে বাসের ব্যবস্থা করলেন। নির্জন, খোলামেলা, জলের স্থান ও আছে। সুতরাং সবদিক দিয়েই ভাল। মহাপ্রভুর পরিচর্যার জন্য রইল গোপীনাথ। সে মহাপ্রভুকে মন্দিরে নিয়ে যায় আবার নিয়ে আসে। পূজারীরা মহাপ্রভুকে বিরক্ত করতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য ধর্মপ্রচারে কোনরকম বাচালতা করেন না। মহাপ্রভু আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়। তিনি সহজ সরল সাধারণ আচরণ করেন। তিনি বিনয়ের অবতার। তাঁর উপদেশ: তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন, কীর্তণীয়ঃ সদা হরিঃ।

ঘাসের মত নীচু হবে। আর বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু। তবে যদি কিছু হয়।

সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যকে বললেন—তুমি সন্ন্যাসী, জ্ঞানমার্গে সাধনা কর। আমি তোমাকে বেদ পড়ে শোনাচ্ছি। বুঝতে চেষ্টা কর!

সার্বভৌম বেদ পড়েন, শ্রীচৈতন্য শোনেন। আটদিনের দিন সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন ?

—সূত্রগুলি বেশ কিন্তু ব্যাখ্যা অবোধ্য।

—আমার ব্যাখ্যা অবোধ্য ?

—শুধু অবোধ্য নয়, প্রমাদপূর্ণ।

এই কথা ! বিচারসভা বসল। সার্বভৌম পরাস্ত হলেন। শ্রীচৈতন্য জয়ী কিন্তু বিনয়াবনত। বললেন—কলিতে নাম ছাড়া গতি নাই।

সার্বভৌম সাধারণ মানুষের মত হরিধ্বনি করেন। আর পরম শান্তিতে হৃদয় ভরে যায়।

পরদিন প্রাতে সার্বভৌম প্রেমধর্মে দীক্ষা নিলেন। জগন্নাথ ধামে রটে গেল, বেদান্তবাদী সার্বভৌম প্রেমে বিশ্বাসী হয়ে শ্রীচৈতন্যের শরণ নিয়েছেন। ফলে ভক্ত বাড়ে।

*

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণদেশে প্রেমধর্ম প্রচার করতে বেরবেন। সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে ভক্তেরা এল তাঁর কাছে। এসে মহাপ্রভুর অমৃত কথা শোনে। রাম রাঘব রাম রাঘব রাজা রাম, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।

দক্ষিণদেশে মুসলমান নাই, যুদ্ধবিগ্রহ নাই। ধর্মপ্রচার চলছে ভাল। জৈন মুণি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণদের শ্রীচৈতন্য প্রেমধর্মের তত্ত্ব সুনিপুণ বোঝাচ্ছেন। প্রেমধর্মে প্রতিষ্ঠা দ্বৈতবাদের। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বরের লীলাও সত্য। জীব ও জগৎ তাঁরই লীলা, সুতরাং অধ্যাস নয়।

শ্রীচৈতন্য তিরুমল ধামে বৌদ্ধ পণ্ডিত রামগিরিকে তর্কে পরাস্ত করলেন। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি রামগিরির নির্বাণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা কুচি কুচি করে। দুঃখের নিবৃত্তি প্রেমে, আর কিছুতে নয়।

অক্ষয়বটে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পরীক্ষা। সত্যাবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈ

রূপে ধনী, যৌবনে গরবিনী। ওরা মহাপ্রভুকে প্রেম নিবেদন করল। বারবিলাসিনীরা আর প্রেমের কী জানে? যা জানে তা কাম কলা। মহাপ্রভু কামকে রূপান্তরিত করলেন প্রেমে, দেহসুখকে মনোসুখে। ওরা তাঁর মধুর সান্নিধ্যে এমন এক সুখ পায় যা আগে পায়নি। এর নাম কৃষ্ণসুখ।

শ্রীচৈতন্য কাঞ্চী, তিরুপতি, তাঞ্জাভুর, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী ইত্যাদি বহুতীর্থ পর্যটন করলেন। মথুরা রামাইত, সদানন্দপুরী, অদ্বৈতবাদী ইত্যাদি বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করলেন। প্রেমধর্মের প্রচার বিস্তৃত ও অপ্রতিহত।

পুনার কাছে খাণ্ডবা নগরী। প্রাচীন খাণ্ডবাদের মন্দিরে দেবদাসীগণ দেবতার সেবাদাসী। সন্ধ্যাকালে আরতি হয়। নাদেশ্বরমের সুরে পাষাণ দেবতাকে গান শোনায়, মৃদঙ্গের তালে নিষ্প্রাণ দেবতাকে নাচ দেখায়। এই দেবসেবার পর ব্রাহ্মণসেবা। কামার্ত ব্রাহ্মণ দেবদাসীর দেহ ভোগ করে। হতভাগিনীদের দুঃখে বেদনায় অপমানে মহাপ্রভু অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। মানুষের প্রতি মানুষের এ কী আচরণ?

শ্রীচৈতন্য নিষ্ঠুর দেবদাসী প্রথার প্রতিবাদ করলেন।

*

দীর্ঘ দু'বছর শ্রীচৈতন্য পথে পথে ঘুরছেন। আর দেখছেন নিত্য নূতন দেশ, নিত্য নূতন মানুষ। কৃষ্ণের কী বিচিত্র লীলা জীব ও জগৎ নিয়ে। আদি নাই, অন্ত নাই। ভাবে বিভোর হয়ে তিনি পশ্চিম সাগর-বেলায় চলেছেন। নাসিক, সুরাট, বরোচ, বরোদা, আমেদাবাদ হয়ে চলেছেন সোমনাথ। পথে এক অহল্যা উদ্ধার।

সাধক জীবনে নারীর একমাত্র পরিচয় জননী। তা সে কুলবধূ হোক আর বারবিলাসিনী হোক। শুভ্রমতী নদীতীরে শ্রীচৈতন্য এক রমণীকে ডাকলেন—মা।

—কে তুমি ?

—সন্ন্যাসী।

—কী চাও ?

—ভিক্ষা।

বারমুখী একটি মুদ্রা দিতে উদ্যত হলে শ্রীচৈতন্য রমণীর চোখে চোখ রাখলেন—মা, আমি বহুদিন মাতৃস্নেহে বঞ্চিত। তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ স্নেহ ভিক্ষা দাও।

বারমুখীর কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয়। গণিকা হয় সাধিকা।

*

শ্রীচৈতন্য প্রভাস, দ্বারকা ঘুরে নীলাচলে ফিরছেন। তাঁর আগমন সংবাদে জনসমুদ্রে আনন্দের জোয়ার এল।

ভক্তগণ চলেছে খোল করতাল বাজিয়ে। সম্মুখে বাসুদেব সার্বভৌম। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে: সার্বভৌম ভট্টাচার্য আনন্দে চলিলা, সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা।

ভক্তগণ প্রণাম করলে মহাপ্রভু সবিস্ময়ে বললেন—তোমরা প্রণাম করলে আমি কুণ্ঠিত বোধ করি।

—কেন প্রভু ?

—আমরা সকলেই জগন্নাথের সন্তান। কেউ বড় কেউ ছোট নই। কে কার প্রণাম নেয় ?

বলে মহাপ্রভু আচণ্ডাল সকলকে আলিঙ্গন করলেন। তুমুল আনন্দে ভক্তগণ নৃত্য করে। এভাবেই মহাপ্রভু এবং তাঁর গণ বাড়ি পৌঁছল।

তীর্থের কথা হতে প্রভু বললেন—অনেক সাধু দেখলাম কিন্তু বৈষ্ণব বিশেষ দেখলাম না।

—একজনও না ? গোপীনাথ আগ্রহের চোখে তাকায়।

শ্রীচৈতন্য চিন্তা করে বললেন—শুধু একজন। রামানন্দ রায়।

তিনি শুধু বৈষ্ণব নন রসজ্ঞও বটে। তিনি আমাকে দুখানি উত্তম গ্রন্থ দিয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতা আর শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত।

কতিপয় ভক্ত নবদ্বীপে গেল। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তমুখে সংবাদ পেল, নিমাই এখন মহাপ্রভু। তাঁর মহিমা অপার। প্রেমধর্মের সর্বত্র জয়। বিষ্ণুপ্রিয়া শুনে যায়। কেমন যেন উদাসীন। সেই ব্যাকুলতা আর নাই।

*

কটক থেকে মহারাজ প্রতাপরুদ্র পত্র লিখেছেন। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রিত। সার্বভৌম পত্র পড়ে শোনালে মহাপ্রভু বললেন, আমি রাজদর্শনে যাব না।

—কেন?

—বিত্তবান্ ও কলাবতীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ বৈষ্ণবের অনুচিত।

সুতরাং সার্বভৌম রাজাকে লিখলেন, মহাপ্রভুর অনুমতি হল না। রাজা প্রতাপরুদ্র, স্বয়ং কটক থেকে পুরীধামে এলেন। জগন্নাথ দর্শনের পর মহাপ্রভু দর্শন মনের ইচ্ছা।

সার্বভৌম, নিত্যানন্দ বা রামানন্দের সঙ্গে দেখা হলে রাজা বলেন মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে চল। কেন তিনি আমার প্রতি বিমুখ?

তা ওঁদের জানা নেই। রামানন্দ রাজার হয়ে ওকালতি করতে শ্রীচৈতন্য কাতরকণ্ঠে বললেন—হরিভক্ত জনগণ আমার প্রাণ। গণ আমাকে ত্যাগ করলে আমি বাঁচব না।

—মহাপ্রভু! রামানন্দ হাত জোড় করলেন—আপনি রাজার সঙ্গে আলাপ করলে ওরা আপনাকে ত্যাগ করবে?

—করবে, কারণ যে ব্যক্তি রাজাকে খাতির করে, সে অবিশ্বাসের পাত্র। ওরা আমাকে সন্দেহ করবে। আমার কাছে আসবে না, হরিনাম নেবে না। হায়।

শ্রীচৈতন্য রোদন করেন।

আষাঢ়ের পুষ্যানক্ষত্রে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি।

রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধুাম, ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম। শ্রীচৈতন্যও লুটিয়ে পড়ছেন। নিত্যানন্দ তাঁকে বুঝি সামলাতে পারে না।

গৌড়ভূমি থেকে অদ্বৈত, শ্রীবাস ইত্যাদি ভক্তেরা এসেছে, তাই আজ মহাপ্রভু মহানন্দে সংকীর্তন করছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টালিকাশীর্ষ থেকে প্রভু ও তাঁর গণের সংকীর্তন যতই দেখছেন ততই তাঁর অহঙ্কার চলে যায়। ইচ্ছা হয়, গণের একজন হয়ে নৃত্য করেন। সংকীর্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার, প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার।

এদিকে মহাপ্রভু গণ নিয়ে ব্যস্ত। আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া, ভক্তে সবে মাখাইলা অতি প্রীত হইয়া। ঈশ্বরপ্রসাদ মাল্য দিলেন গলায়, আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য কৃপায়।

চন্দনচর্চিত মাল্যশোভিত মহাপ্রভু ও তাঁর গণ মন্দির পথ ঝাঁট দিচ্ছেন। এ আবার কী? এ মহাপ্রভুর সাধন, অস্পৃশ্য অশুচি ঝাড়ুদারদের সহিত একাত্মবোধের অসাধ্য সাধন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র অট্টালিকাশীর্ষ থেকে পথের ধূলায় নামলেন।

মহাপ্রভুর অধরে মধুর হাসি। বলছেন—সব আবর্জনা একস্থানে কর। যার কাজ বেশী সে পুরস্কার পাবে, আর যার কাজ কম সে পাবে তিরস্কার।

ঝাঁট দেওয়া হলে মহাপ্রভুর আজ্ঞা হল, জল ছিটাও। পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আসে শত ভক্তগণ, পূর্ণঘট লইয়া যায় আর শতজন।

শতজনের একজন রাজা। সকলে রথের দড়ি ধরে টানে আর জগন্নাথ ষোলো চাকার রথে আসীন হয়ে দূরে যান। আসীনো দূরং ব্রজতি দেবতা।

*

চার মাস মহানন্দে কাটল। এবার অদ্বৈত, শ্রীবাস ইত্যাদি

ভক্তগণ দেশে ফিরবে। মহাপ্রভু সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—হে আমার গণ, তোমরা বাড়ি যাচ্ছ যাও। আসছে বছর আবার এস।

জনগণ সজল চোখে বিদায় নিল। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতাচার্যকে বললেন—গৌড়ভূমে তুমিই মহাপ্রভু। তোমাকে শেখাবার কিছুই নাই তবু বলি, মুর্খ, দরিদ্র্য, অন্ত্যজ ও পতিতা, এদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিও। হরে কৃষ্ণ।

সকল ভক্তকে উপদেশ দেওয়া হলে মহাপ্রভু শ্রীবাসের মুখের দিকে তাকালেন। মনে পড়ে কত কথা, কত স্মৃতি সুখে গাঁথা, পাসরিতে শকতি যে নাই। মহাপ্রভু জন্মভূমি, গঙ্গাতীর, গৃহকোণ ভুলতে পারছেন না কিছুতেই। স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী ঘরণী মনের মণিকোঠায় ঠাঁই নিয়েছে। শ্রীবাস মালিনী এবং যত সখাগণ হৃদয় মথিত করে।

বললেন—কে জানে, মালিনী হয়ত ঠিকই বলেছিল।

—কী বলেছিল ?

—প্রেমধর্মে সন্ন্যাসের প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভু শ্রীবাসের হাত ধরলেন—তুমি সন্ন্যাসী হও নাই বলে কী আমার চেয়ে কম ভক্ত ?

শ্রীবাস নীরব।

মহাপ্রভু আবার বললেন—উচ্চাশার বশে আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই সন্ন্যাস নিয়েছিলাম। মার কথা ভাবি নাই, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাই নাই।

শ্রীবাসের মনে আশা জাগে। বললেন—প্রভু ফিরে চলুন।

শ্রীচৈতন্য মাথা নাড়লেন। এখন আর তা হয় না। এভাবেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করতে হবে। বললেন—শ্রীবাস, রাজা প্রতাপরুদ্র আমাকে একটি স্বুবর্ণ সূত্র গ্রথিত শাড়ি দিয়েছে। এটি তুমি বাড়িতে দিও।

মহাপ্রভু প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম অনুচ্চারিত রাখলেন। তাঁর সন্ন্যাস অক্ষুন্ন রইল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে : মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম সম্যক বুঝেছিল মাত্র সাড়ে তিন জন। স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহান্তি এবং মাধবী দাসী।

মাধবী নারী, নারী কখনও পুরুষের সমান হতে পারে না। তাই সে আদ্ধেক। মাধবীকে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য প্রশ্রয় দেন। মাধবী মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করে বসল। মনে গোপীভাব। পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্যই একমাত্র আপনজন। শ্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ।

মাধবী, শিখি আর মুরারি যেন তিন ভাই। মাধবী শাস্ত্রপাঠে ও পাণ্ডিত্যে ভ্রাতাদের সমকক্ষ, আর আচরণে তাঁদেরই মত ঋজু ও বলিষ্ঠ।

একদিন সকালে শ্রীচৈতন্য গরুড়স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করছেন। তাঁর নয়নে প্রেমাশ্রু। তিন ভাই একদৃষ্টে মহাপ্রভুকে দেখছেন। মাধবীর চোখে জল এসে যায়।

সহসা মহাপ্রভু শিখিকে আহ্বান করলেন। তিনজন ত্বরায় এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। মহাপ্রভু শিখিকে আলিঙ্গন করলেন।

শিখির শরীর রোমাঞ্চিত হয় অনির্বচনীয় পুলকে। আর মনের সব সংশয় চলে যায়।

বাড়ি ফিরে শিখি মাধবীকে বলেন—এ কেমন হল? শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করল আর আমি মোহিত হয়ে গেলাম?

—তাই হয়। মাধবী ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল—মহাপ্রভু কাউকে শিষ্য করেন না, কানে মন্ত্র দেন না। কিবা অপরূপ রূপ তাঁর। চম্পক শোনকুসুম কনকাচল জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে। তাঁর রূপ দেখে মানুষ মোহিত হয়।

—মেয়েমানুষ হতে পারে কিন্তু আমি পুরুষমানুষ।

—কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। তুমি আমি সকলেই নারী।

শিখির মনেও গোপীভাব আসে।

*

শ্রীচৈতন্যের আচরণে নরনারী মুগ্ধ। তিনি জ্ঞান দিচ্ছেন না,

জ্ঞানের কথাও লিখছেন না। তাঁর বিনীত আচরণই সব। বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে যায়, করিয়া কলুষনাশ প্রেমেতে ভাসায়।

শ্রীচৈতন্য অন্তরের মাধুর্য দিয়ে পরকে আপন করছেন। ক্লান্তি নাই ক্ষান্তি নাই। উড়িষ্যার প্রায় সকল নরনারী তাঁর শরণাগত।

এদিকে গৌড়ভূমি থেকে দলে দলে লোক আসছে। এবার দোলের সময় নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচল যাত্রার উদ্যোগ করলে বৈষ্ণবীগণ বলল, ওরাও মহাপ্রভুকে দর্শন করবে। কুড়ি দিনের পথ আর পথে নারী বিবর্জিতা। ওরা নিবৃত্ত হল না। যাবেই। শুধু হাতে যাবে? না। যে যে দ্রব্য জানেন প্রভুর বড় প্রীত, সবেই লইলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত। প্রভু শাক ভাজা, থোড়-ছেঁচকি, মোচা-ঘণ্ট, লাউয়ের পায়েস খেতে ভালবাসেন। শাকসবজি পুরীতেই সংগ্রহ করার আশ্বাস দিলে বৈষ্ণবীগণ অন্যান্য বস্তু সঙ্গে নিলেন।

মহাপ্রভুর মাসীর বড় বড় বোঁচকায় রকমারি ডালের বড়ি। মালিনীর বিরাট বিরাট পুঁটুলিতে বিবিধ প্রকার নাড়ু। শচীমাতাও বিষ্ণুপ্রিয়া যা দিয়েছে তাও কয়েক ঝুড়ি।

কুড়ি দিন পায়ে হেঁটে তো সব নীলাচলে পৌঁছলেন। তারপর? বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ, দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন।

বৈষ্ণবীগণ আনন্দে কাঁদছেন। কাঁদলেই হবে, মহাপ্রভুকে রেঁধে খাওয়াবে না?

মালিনী পাকা কলার মোচা নিখুঁত ছাড়ায়, পরিপাটি শাক বাছে আর পায়েসের জন্য লাউ কুচোয় কাঠির মত সরু সরু। মাসী খুব মন দিয়ে রাঁধে। শ্রীলক্ষ্মীর অংশে যত বৈষ্ণবগৃহিণী, কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি।

শ্রীচৈতন্য খান আর বলেন—এ আমার মা-র হাতের বড়ি, এমন হালকা বড়ি কেউ পাততে পারে না।

চার মাস মহানন্দে কাটল। এবার শ্রীবাস আদি ভক্তগণ ও

তাঁদের গৃহিণীরা বাড়ি ফিরবে। মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যস্ত। ব্যথিত চিত্তও বটে। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য বিবিধ তৈজসপত্র এবং ভোগসামগ্রী দিয়ে তিনি দামোদরকে বললেন—এই শাড়িটি মাকে দিও।

দামোদরের চোখে জল এসে যায়। সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত শাড়ি যার জন্য, তার নাম উচ্চারণ করলে কী এমন দোষ?

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণ একে একে মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রার্থনা করে। তিনি সকলকেই বলেন—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলম্ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নিত্যানন্দ আজ্ঞা প্রার্থনা করলে মহাপ্রভু বললেন—শ্রীপাদ, তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ কর, বিবাহ কর, সংসার কর। এই তিন ইচ্ছা আমার। হরে কৃষ্ণ।

শ্রীবাস ও মালিনী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সাধে কী লোকে বলে, মহাপ্রভু প্রেমধর্মের সার্থক উদ্গাতা, কখনই তিনি এই ধর্ম সন্ন্যাসের রুক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন না।

মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে স্পষ্টই বললেন—যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাবিষ্ট হয়ে।

বিষয়ে আসক্ত হয়ো না। আসক্তিই দুঃখের।

*

গৌড়জন বিদায় নিলে মহাপ্রভু বিরলে বসে ভাবছেন। চার বছর হয়ে গেল, জননীকে দেখেন নাই, বৃন্দাবনও অদৃষ্ট রয়ে গেছে। এবার যাত্রা করবেন, আর দেরী নয়।

ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সার্বভৌম জানালেন, পশ্চিম দেশে এখন বড় শীত। শীত গেল, দোল এল। মহাপ্রভুর যাত্রা হল না।

রথের সময় গৌড়জন আবার এসেছে নীলাচলে। মহানন্দে কাটল চারমাস। বিজয়াদশমীর আগে মহাপ্রভু ও তাঁর গণ যাত্রা করবেন ঠিক হল।

সন্ধ্যায় নামকীর্তন হচ্ছে। মহাপ্রভু বাইরে থেকে শুনলেন, তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে শ্রীবাস ও অদ্বৈতাচার্য। প্রভু ত্বরায় ভেতরে এলেন—একি করছ তোমরা? আমার নাম কীর্তন করছ কেন?

—তুমি যেমন করাচ্ছ তেমনি করছি আমরা। শ্রীবাস করজোড়ে বলে—তুমিই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ।

—না। মহাপ্রভু কাতর হলেন—তোমরা আমার আবাল্য পরিচিত, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তোমরা আমার সর্বনাশ করবে?

—কিসের সর্বনাশ বুঝিয়ে দাও।

—পণ্ডিত, আত্মপ্রচার অত্যন্ত গর্হিত, কারণ এভাবেই গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী হলেই কলহ।

শ্রীবাস মৌন রইলেন। একেই বৈষ্ণবতম বলে।

মহাপ্রভুর মতে বৈষ্ণব তিন প্রকার। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম। যার দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আসে তিনি বৈষ্ণবতম।

*

শ্রীগৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া, প্রাণহীন হইল অবলা। বিষ্ণুপ্রিয়া : পদকর্তার প্রার্থনা। শ্রীচৈতন্য ত্বরায় চলুন, কারণ অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝি মারা যায়।

শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা নৃত্যগীত করতে করতে নবদ্বীপ যান। স্বরূপ গাইবে আর তিনি নাচবেন। গাইয়ের খোঁজ পড়ল। স্বরূপকে না পেয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল। যখন ও বাসায় ফিরল হাতের গীতা দিয়ে মারলেন। স্বরূপ গান ধরলে মহাপ্রভু বাহুতুলে নাচছেন। শত শত ভক্ত যোগ দিল। সকলে গৌড় অভিমুখে চলেছে।

নীলাচল থেকে গৌড় যাবার তিনটি পথই বন্ধ। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। এখন কী উপায়? মহানদীর ওপাড়ে মুসলমান সেনাপতি তুমুল হরিধ্বনি শুনে এপাড়ে গুপ্তচর পাঠালেন। সে দলে

পড়ে নামগান করল আর সেনাপতি বলল—চৈতন্যদেবেরে আমি সাহায্য করিব, মনুষ্য জনম আজি সফল হইব।

মহাপ্রভুর নৌকার সঙ্গে দশনৌকা সৈন্য চলেছে। ভক্তগণ নির্বিঘ্নে পানিহাটি পৌঁছল। এখানে একরাত্রি বাস করে মহাপ্রভু কুমারহট্ট চললেন। তিনি নৌকায় দাঁড়িয়ে বাহু তুলে নাম করছেন আর দু'পাড়ে গণ তাই করছে। হরি হরয়ে নমঃ।

কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ি আছে, মহাপ্রভু সেখানে উঠলেন। এই বাড়িতে প্রথম যৌবনে তিনি নাম কীর্তন করেছেন, কর্মপন্থা ঠিক করছেন। মালিনী শ্রীচৈতন্যের আগমনে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। এ কেমন কৃতার্থবোধ? চণ্ডীদাসের পদে যেমন আছেঃ এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ, মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ।

চাঁদমুখ দেখে মালিনীর বুক ভরে যায়।

প্রেমে শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়।

শান্তিপুরে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে উঠেছেন। ইচ্ছা ছিল, দিনকয়েক নির্জনে থাকবেন, তার উপায় নাই। দলে দলে লোক আসছে। লক্ষাধিক লোক অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি ঘিরে কলরব করে—দর্শন দাও, দর্শন দাও।

মহাপ্রভু ছাতে উঠে দর্শন দিলেন। পার্ষদগণ পরামর্শ করলেন, মহাপ্রভুকে গভীর রাত্রে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। মহাপ্রভু বিদ্যানগরে গেলেন। জনগণ জানতে পেরে ধাওয়া করল। অকস্মাৎ লোকসব, করি হরি হরি রব চতুর্দিকে ধাইতে লাগিল। বিদ্যানগর লোকে লোকারণ্য।

মহাপ্রভু গোপনে ফুলিয়ায় মাধবদাসের বাড়িতে উঠলেন। এক প্রহর না যেতেই লক্ষ লোক সমবেত। তখন মাধবদাস কী করলেন? নিশায় মাধবদাস বহুলোক লইয়া, বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বাঁধে যাইয়া। শেষরক্ষা হল না। প্রাতঃকালে বাঁশ-গড় সব চূর্ণ হয়, লোক-ঘটা নিবারিতে কারো শক্তি নয়।

অগণন নরনারী বিবিধভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে। কেউ বাতাসা ছড়াচ্ছে কেউ বাতাসা কুড়োচ্ছে। দুজনের মুখেই কৃষ্ণনাম দুজনই সুখী। হরিলুটের পর দুজনই ধূলায় গড়াগড়ি যায়।

গঙ্গার এ-পাড়ে ফুলিয়া ও-পাড়ে নবদ্বীপ। শ্রীচৈতন্য এপাড়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া ওপাড়ে। তবু ও প্রিয়তমকে দেখতে পায়। কারণ মহাপ্রভু দীর্ঘকায়, সব মাথা ছাড়িয়ে তাঁর মাথা। বিষ্ণুপ্রিয়ার মন যেন বলল: কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।

মহাপ্রভু সপার্ষদ নবদ্বীপে আগত। তাঁর পরণে গেরুয়াবাস হাতে দণ্ড পায়ে খড়ম। তিনি পরিচিত গঙ্গাতীর, ঘরবাড়ি, তরুলতা দেখতে দেখতে নিজবাড়িতে আসছেন। ধীর গতি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে উল্লাস। বুঝি শতেক বরষ পরে তিনি ঘরে আসছেন। এখন ও কী করবে? শ্রীরাধার মত বলে বেড়াবে: বঁধু এসেছে, বঁধু এসেছে। বিরহব্যথিত বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়তমকে দেখছে আর ভাবছে। সো পঁহু সুপুরুষ ভঁওরা, চিবুক ধরি অধর-মধু পিয়ব হামারা?

আনমনা বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ি ফিরল। চিত্ত এমনই ব্যাকুল যে চুল বাঁধা হল না, সেই উপহারের শাড়ি পরা হল না। ত্বরায় গিয়ে মহাপ্রভুর পায়ে পড়ল। কে তুমি? বলে মহাপ্রভু চমকে উঠলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—আমি তোমার দাসী।

—না। আমার দাসী নয়। মহাপ্রভু মৃদুস্বরে প্রিয়নাম উচ্চারণ করলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া! নামের সার্থকতা কর।

—করব। বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলে তাকায়—শুধু একটা অবলম্বন।

মহাপ্রভু পায়ের খড়ম খুলে দিলে পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া গভীর প্রেমে পাদুকা চুম্বন করল। করতেই মনে হল, কে যেন তার অধর-মধু পান করছে। মনই তো সব। কথায় বলে, মনের গুণে ধন।

[চার]

দেহ, মন, ও প্রাণ, তিন নিয়ে জীব। দেহবোধ তার স্বভাবধর্ম। সে স্বভাবধর্মে সম্ভোগ করে কিন্তু সম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা নয়। আরও বড় সুখ আছে। দেহানুগ অথচ ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ হলে কাম আরও সুখের। ভাবকল্পনা মনের কাজ।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়তমের খড়ম বুকে চেপে মিলনসুখ কল্পনা করে। এ এক সাধনা।

শ্রীচৈতন্যের আর এক সাধনা। তিনি দেহকে অতিক্রম করতে অর্থাৎ কামকে জয় করতে চান। তিনি রাধাভাবে ভাবিত। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে বৃন্দাবন চলেছেন। চল মন বৃন্দাবন।

ঝাড়খণ্ডের গভীর অরণ্যানীর ভেতর দিয়ে পথ। অতি বিজন। আরণ্যক নীরবতা অনুভবের সুখে তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তিনি বিহ্বল চিত্তে হাটেন, বসেন, কোন চঞ্চলতা নাই। রাতে বলভদ্র অগ্নি প্রজ্বালিত করে, তিনি নিদ্রা যান।

প্রভাত কাল। পাখি সব করে রব। শ্রীচৈতন্য কান পেতে শুনলেন কিছুক্ষণ। তারপর বলভদ্রকে বললেন, কী সুমিষ্ট কলকাকলী! শুনে আমি অত্যন্ত প্রীত।

শ্রীচৈতন্য আনন্দে কৃষ্ণনাম করেন আর পথ চলেন। আদিবাসী নরনারী তাঁর অনুসরণ করে। কিছুক্ষণ পর তাদের কণ্ঠেও কৃষ্ণনাম শোনা যায়।

বারানসী পৌঁছে মহাপ্রভু তপন মিশ্রের আতিথ্য স্বীকার করলেন। এই তপন মিশ্রকে তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে বলেছিলেন,—তুমি কাশী যাও। সে কাশীতে নামপ্রচার করে।

কাশীর অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে প্রকাশানন্দ প্রধান। মহাপ্রভু তাঁর কাছে গেলে তিনি সাধারণ সৌজন্যও দেখালেন না। বিচারসভায় শ্রীচৈতন্যের আর আগ্রহ নাই। তিনি বারাণসী ত্যাগ করলেন। তাঁর মন পড়ে আছে বৃন্দাবনে।

*

মধু বৃন্দাবনধাম প্রেমের পীঠস্থান। যমুনাপুলিন। কদম্বতরু, গোকুল, মধুবন সবই মধুময়। যমুনাতে ঢেউ দিতে, বিশ্ব উঠে আচম্বিতে। বিশ্বের মাঝারে শ্যামরায়ে। শ্যামরায়ের লীলাভূমি তাই এত মধুর।

শ্রীচৈতন্য যমুনায় ঝাঁপ দিচ্ছেন। পথে যাঁহা হয় যমুনা দর্শন, তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন।

এক ব্রাহ্মণ, নাম কৃষ্ণদাস, মহাপ্রভুকে জল থেকে তুলে বাড়ি নিয়ে এলেন, ভোজন করালেন। বিশ্রামের পর মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন দেখাতে নিয়ে চলেছেন। মহাপ্রভু কদম্বতরু দেখলেই আলিঙ্গন করছেন। সর্বশরীর আনন্দে কণ্টকিত। কৃষ্ণদাস বাক্যহারা।

মহাপ্রভু গলা থেকে মালা খুলে কৃষ্ণদাসকে পরালেন। পরিয়ে বললেন—গুঞ্জমালী, এবার কৃষ্ণনাম প্রচার কর।

কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে ও কেরলে মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। নামপ্রচার বিস্তৃত হল সমগ্র ভারতে।

*

বৃন্দাবন থেকে শ্রীচৈতন্য নীলাচল ফিরে চলেছেন। শান্ত সমাহিত। বারাণসীতে পুনর্বার প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মুখোমুখি। সঙ্গে সনাতন ও তিনজন ভক্ত। এবার শাস্ত্রবিচার হবে।

মহাপ্রভু করজোড়ে সমবেত জনগণকে নমস্কার করলেন। তারা মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে। কে এই সৌম্যদর্শন গৌরকান্তি সন্ন্যাসী? মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদ পদপ্রক্ষালনের স্থানে উপবেশন করলে সভাস্থ

কুতুহলী জনগণ বলাবলি করে: কে এই বিনয়ের অবতার? এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর পরিচয় দিলেন।

প্রকাশানন্দ চন্দ্রাতপতলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ন্যায় আসীন। তিনি বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্র, ব্রহ্মাধিকরণম্, নিয়ে কূট চিন্তা করছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বিনীত আচরণ দেখে বিমর্ষ। বুদ্ধি যেন ঠিক ঠাক কাজ করছে না। যা কাজ করছে তা তাঁর হৃদয়। কথায় বলে, হৃদয় বড় বালাই। প্রকাশানন্দ অদ্বৈতবাদী মহাপ্রভুর প্রেমে পড়লেন। গভীর প্রেম। তিনি আসন ত্যাগ করে এসে মহাপ্রভুর করকমল ধরেছেন—তুমি এখানে বসে আমার হৃদয়ে ব্যথা দাও কেন?

মহাপ্রভু ভুবনজয়ী হাসি হাসলেন। শাস্ত্র বিচার করে তিনি প্রতিপন্ন করলেন যে, বেদান্তের শঙ্করভাষ্য বড় নীরস, রসে বশে থাকাই ভাল। রসো বৈ সঃ। জীবন জুড়ে খেলা রসের। বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত, মধুর। পাঁচটি রসের পরিণাম মধুর। জীব মধুর, জগৎ মধুর, ঈশ্বর মধুর। মধুরাধিপতে: অখিলম্ মধুরম্।

প্রকাশানন্দ বৈষ্ণব হলে কাশীধামে যা ঘটল তা বিপ্লবের নামান্তর। উচ্চনীচ ধুলায় গড়াগড়ি যায় আর হরিধ্বনি দেয়।

*

শ্রীচৈতন্য জীবনে দুটি কথা সার বুঝেছিলেন। এক, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। দুই, প্রেমই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা।

কাশীধামে প্রেমের বন্যা বইয়ে শ্রীচৈতন্য বিদায় নিলেন। নিয়ে যে অরণ্যপথে এসেছিলেন, সেই অরণ্যপথে ফিরে চলেছেন। তখন শীতকাল ছিল, এখন গ্রীষ্মকাল। মহাপ্রভু তৃষ্ণার্ত হয়ে এক কলস তক্র পান করলেন। গোপ বলল—ঠাকুর, ঘোলের মূল্য দিন।

—মূল্য? শ্রীচৈতন্য মৃদু হাসলেন—মূল্য নিয়ে তুমি কী করবে?

—বুড়ী মা আছে, যুবতী স্ত্রী আছে, তাদের জন্য চাল ডাল কিনব।

এই কথায় মহাজ্ঞানী শ্রীচৈতন্য ব্যাকুল হলেন। তাঁরও তো বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী স্ত্রী আছে। তিনি তাদের কথা ভাবেন না। তাঁর ব্যাকুলতা সবিশেষ প্রকাশ করতে না পেরে ঠাকুর লোচনদাস চৈতন্য-মঙ্গলে লিখলেন : অন্তরীক্ষে দেহ লয়ে গৃহেতে আসিলা, মহাপ্রেমে জননী ঘরণী মিলিলা।

শ্রীচৈতন্য অরণ্যপথে আনমনা চলেছেন। তিনি তরুলতা পশুপক্ষী সবই দেখছেন আবার কিছুই দেখছেন না। আঠার নালায় আসতে নীলাচলে ও নবদ্বীপে ভক্তগণের নিকট তাঁর আগমন বার্তা গেল। অদ্বৈতাচার্য বার্তা পেয়েই নীলাচলে এলেন। মহাপ্রভু জায়া ও জননীর কুশল সংবাদ নিলেন। অদ্বৈত বললেন—প্রভু, আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখায়।

—বয়স তো হল।

—বয়স? ত্রিশ বৎসর বয়স!

মহাপ্রভু মন্তব্য করলেন না। তাঁর মনে অন্য চিন্তা। একটি সংস্কৃত শ্লোক বললেন - যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা···। তারপর ব্যাখ্যা করছেন—প্রিয়া তার প্রিয়কে বলছে : যেদিন তুমি আমার কৌমার্য হরণ করেছিলে সেদিন যে আনন্দ পেয়েছিলাম, আজ তো সেই সুখ পেলাম না।···কেন পেল না?

অদ্বৈতাচার্য নীরব। শ্রীরূপ সহসা বললেন—অনুভবেই সুখ। ব্যবহার অনুভূতি নষ্ট করে।

—সবিশেষ ব্যক্ত কর।

—লিখে করব।

দিন যায়, শ্রীরূপ কিছু বলেন না। একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রস্নান সেরে বাড়ি ফিরছেন, কী খেয়াল, শ্রীরূপের কুটিরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন চালে একটি তালপাতা। প্রভু পাঠ করছেন : প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ······। তাঁর শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। বললেন—শ্রীপাদ, তুমি আমার

মনের কথা লিখেছ। শ্রীমতী রাধা যেখানেই থাকুন, তাঁর মন কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি। সেই প্রথম মিলনের ভাবনায় যে সুখ, তার কাছে সঙ্গম কিছু নয়।

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে প্রায় এক বছর কাছে রেখে বৃন্দাবন পাঠালেন। সেখানে রূপ অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। রূপ গোঁসাই কৈল রসামৃত সিন্ধুসার, কৃষ্ণভক্তি রসের যাহা পাইয়ে নিস্তার। উজ্জ্বল নীলমণি নাম গ্রন্থ আর, কৃষ্ণধারা লীলারস তাহা পাইয়ে পার। দানকেলি কৌমুদি আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল, সে সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল।

মহাপ্রভুর উৎসাহে রূপ গোস্বামীর ন্যায় জীব গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও আরও কয়েকজন গ্রন্থ রচনা করলেন। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করলেন না।

*

শ্রীচৈতন্য রামানন্দ রায়কে উৎসাহ দিলেন নাটক লিখতে ও মঞ্চস্থ করতে। মহাপ্রভুর আজ্ঞা, সুতরাং রামানন্দ উত্তম নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন। 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক লেখা হয়েছে এখন যোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রয়োজন। অভিনেত্রীদের গোপীর ভূমিকায় কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করতে হবে। সুস্বর, সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ, সতৃষ্ণ নয়ন বাণ। প্রেমানন্দধার, মধু হাসি, লজ্জা, আলিঙ্গন, মান। রামানন্দ রূপ যৌবনবতী দেবদাসীদের নাচতে গাইতে সোহাগ করতে শেখাচ্ছেন। কঠিন কাজ। রামানন্দ নির্জনে তাদের ছলকলা শেখান। তারা শেখে।

মহাপ্রভুর জ্ঞাতি প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের কাণ্ড দেখে অস্থির। তিনি শ্রীচৈতন্যের কাছে অভিযোগ করলেন। প্রভু হেসে বললেন— রামানন্দের হৃদরোগ নাই, সুতরাং আশঙ্কা কিসের?

—দুর্নামের।

—প্রদ্যুম্ন, তুমি বিচলিত কারণ তোমার ধাতু আলাদা। নাম জপ কর, শান্ত হবে।

প্রদ্যুম্ন নাম জপ করতে না পেরে রামানন্দের কাছে গেলেন। গোপী গান করে—সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র যতই শোনেন ততই তাঁর প্রাণের আকুলতা বাড়ে। একসময় তিনি নামজপ করতে সুরু করলেন।

মহাপ্রভু রামানন্দকে অধিকার দিয়েছেন যুবতীঅঙ্গ স্পর্শ করতে। তিনি দেবদাসীদের স্নান করান, গা মুছিয়ে দেন, শ্রীচৈতন্য কিছু বলেন না। অথচ হরিদাস মাধবীর সঙ্গে হেসে কথা বলায় মহাপ্রভু বিরক্ত। এমন বিরক্ত যে বললেন—হরিদাসের দণ্ড পাওয়া উচিত।

হরিদাস মাধবীর কাছে গিয়েছিল সরু চাল আনতে, এখন এই সর্বনাশ। চরিতামৃতে আছে : তিন দিন হরিদাস করে উপবাস, স্বরূপাদি সবে পুছিলেন প্রভুপাশ। প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।

মহাপ্রভু হরিদাসকে ত্যাগ করলেন। এক বছর অনুনয় বিনয় করেও কিছু হল না। হরিদাস প্রয়াগ সঙ্গমে আত্মবিসর্জন দিল।

মহাপ্রভুর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, অধিকারী ভেদে অধিকার। তিনি অবস্থা বুঝে নিত্যানন্দকে সংসারী করেছেন, রামানন্দকে যুবতী শরীর স্পর্শের অধিকার দিয়েছেন আবার হরিদাসকে প্রকৃতি সম্ভাষণের অপরাধে ত্যাগ করেছেন। কে জানে, এই প্রকৃতি মাধবী না হয়ে অন্য কেউ হলে মহাপ্রভু কী করতেন।

*

শ্রীচৈতন্য কঠোর নিয়ম মেনে চলেন। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়। কৃচ্ছ্রসাধনে শৈথিল্য নাই, নামজপে বিরতি নাই।

মধ্যাহ্নবেলা। মহাপ্রভু কঠিন মেঝেয় হাতের উপর মাথা রেখে শুয়েছেন। মুখে হরিনাম। এমন সময় এক উৎকল বালক তাঁর পায়ের কাছে বসল। বালকের সুন্দর মুখে এমন কিছু আকর্ষণীয় ছিল যা তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। হেসে বললেন—কী নাম তোমার?

—মাধব।

—সুন্দর নাম। তোমার পিতা কী করেন?

—পিতা নাই।

মহাপ্রভু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আহা! পিতৃহীন বালক। কে জানে, হয়ত ভালমন্দ খেতে পায় না। ডাকলেন—দামোদর।

দামোদর ত্বরায় তাঁর কাছে এল, বালককেও দেখল। মহাপ্রভু বললেন—মাধবকে চেন?

—চিনি।

দামোদরের গম্ভীর গলা, স্পষ্টই বোঝা যায় দামোদর খুশী হয় নাই। মহাপ্রভু বললেন—বাড়িতে যদি প্রসাদী মোদক থাকে, মাধবকে দাও।

এরপর মাধব প্রায়ই মহাপ্রভুর কাছে আসে। বালকের যেমন স্বভাব, প্রশ্রয় পেলেই সাহসী হয়। মাধব একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করে, মহাপ্রভু হাসিমুখে উত্তর দেন।

আজ মাধব আবদার ধরল, মহাপ্রভুর সঙ্গে মন্দির যাবে। প্রভু হাঁ-ও বলতে পারেন না, না ও বলতে পারেন না। সন্ন্যাসী কোন পিতার ন্যায় বালকের হাত ধরে মন্দিরে যেতে পারে না। কিন্তু তিনি মাধবকে কোন প্রাণে বিমুখ করবেন?

মহাপ্রভু মাধবের হাত ধরেছেন, দামোদর ভ্রূকুটি করল—মাধব, তুমি আমার সঙ্গে এস।

—কেন? মহাপ্রভু ব্যথিত চোখে তাকালেন—আমার সঙ্গে কোন দোষ আছে?

—আছে।

—কী?

—পরে নিবেদন করব।

মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দামোদর বলল—মহাপ্রভু, তুমি কাকে সর্বাপেক্ষা বেশী মান্য কর?

—জনগণকে।

—সেই জনগণ মনে করে তুমি জগন্নাথের ন্যায় মহান্। তোমার সেই মহত্ত্ব সকল সন্দেহের অতীত। যদি তুমি মাধবকে প্রশ্রয় দাও জনগণ ভাববে তুমি মাধবের মা-র প্রতি আসক্ত।

—দামোদর!

—মাধবের মা সুন্দরী, যুবতী এবং বিধবা। জনগণ একথা জানে।

—চুপ কর। দামোদর চুপ কর। আর আমাকে বোঝাতে হবে না।

দামোদর চুপ করল।

*

মহাপ্রভু উদাসীনবৎ আসীন।

দিবানিশি কাঁদছেন। ভক্তগণ বলছে, কৃষ্ণবিরহে মহান সাধক এরকমই করে থাকেন। হতে পারে। কিন্তু এভাবে কী কেউ বাঁচে? জগদানন্দ নবদ্বীপ থেকে বিষ্ণুতেল নিয়ে এল। মাথায় দিলে বায়ু শান্ত হবে, দিনরাত কাঁদবেন না।

গোবিন্দ তেল মাখাতে এলে শ্রীচৈতন্য বললেন, মহাপ্রভু সামান্য গৃহীর ন্যায় সুগন্ধি তেল মাখতে পারে না। ঐ তেলে জগন্নাথ মন্দিরের প্রদীপ জ্বলবে।

মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিয়ম ছিল চারিপণ। তিনি নূতন নিয়ম করলেন একপণ। ফলে তিনি প্রায় অনশনেই থাকেন। দেহ ক্ষীণ, কণ্ঠাস্থি প্রকট, পাঁজরের হাড়গুলি গোনা যায়। তিনি কঠিন মেঝের ওপর শুকনো কলাপাতা বিছিয়ে শয়ন করেন। এ কি কৃচ্ছ্র সাধনা!

জগদানন্দ মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত বর্হিবাস সেলাই করে একটি তোষক

আর একটি বালিশ বানালেন। তিনি রাগ করে বললেন—মহাপ্রভু সামান্য গৃহীর ন্যায় ভোগক বালিশ ব্যবহার করতে পারে না। তখন শুকনো কলাপাতা আনা হল। এই যথেষ্ট।

মহাপ্রভুর মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স। এই বয়সেই তিনি চোখে ভাল দেখতে পান না, কানে ভাল শুনতে পান না। কথায় কথায় মূর্চ্ছা যান। পদকর্তার বর্ণনা এই রকম। কাঁদে গোঁসাই রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনুমনে, অঙ্গ ধূলায় ধূসর। চক্ষু অন্ধ, অনাহার, আপনার দেহভার, বিরহে হইল জর জর।

দামোদর সংবাদ দিতে নবদ্বীপ গেলেন। যাবার সময় সঙ্গে নিলেন মহাপ্রসাদ ও বিবিধ সামগ্রী। ভৃত্য ঈশান সে সব তুলে রাখল।

শচীমাতা পুত্রের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে দামোদর আনন্দে মহাপ্রভুর যশ, খ্যাতি ও মহিমা বর্ণনা করল। সমগ্র ভারতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমকক্ষ কেউ নাই। তিনি ভগবানের পূর্ণ অবতার।

শচীমাতার অনেক বয়স হয়েছে। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ। তবু মনে পড়ে, এক দুরন্ত বালক আস্তাকুঁড়ে হাঁড়ির ওপর বসে থাকত, পথের কুকুর বাড়ি নিয়ে আসত, গঙ্গায় নাইতে নামলে উঠতে চাইত না। সেই নিমাই ভগবানের অবতার।

বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর পেছনে বসেছিল। সেও মহাপ্রভুর মহিমা শুনল। শুনে কেমন যেন হয়ে যায়। দুঃখীও না সুখীও না। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ নারী।

দামোদর নীলাচলে ফিরে যাবে। শচী ফুলবড়ি দিল, বিষ্ণুপ্রিয়া দিল নারকেল নাড়ু আর ক্ষীরসার। মালিনী আমকাসন্দি দিল আর সীতাদেবী দিল পুরাণ শুকতা। আর এক ভক্তিমতী রাঘবের বিধবা বোন দময়ন্তী। ও বড় রন্ধনপটিয়সী, এমন আহার্য পাক করে যে এক-বছর ঠিক থাকে। দময়ন্তীর সম্ভারকে মহাপ্রভু বলেন, রাঘবের ঝালি।

ঝালির বর্ণনা এই রকম। শালিতণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া, ঘৃতাসক্ত-

কৈল চিনি পাক দিয়া। কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস, চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম সুবাস। শালিধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া; চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া। রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী, তুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি।

দামোদর পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে নীলাচল ফিরে চলল। মনে উৎকণ্ঠা, মহাপ্রভু কেমন আছে ?

*

মহাপ্রভু যাবতীয় আহার্য দেখলেন। গোবিন্দ রাঘবের ঝালি নিবেদন করলে উদাস গলায় বললেন—আজ থাক।

পরদিন মহাপ্রভু স্নানশেষে জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করছেন। তাঁর যেমন রীতি গরুড় স্তম্ভের পাশে বিভোর, বাহ্যজ্ঞান নাই। এক তরুণী মহাপ্রভুর কাঁধে পা রেখে গরুড়ের উপর আরোহণ করেছে। সেও জগন্নাথ দর্শনে বিভোর।

গোবিন্দ ত্বরায় এসে তরুণীকে ভৎর্সনা করতে লাগল। মহাপ্রভু অনায়িক গলায় বললেন—আহা! প্রকৃতিকে তিরস্কার কোরো না।

—করবে না। আপনার শরীরের এই অবস্থা। গোবিন্দ চীৎকার করে—নামো।

তরুণী নেমে পড়ে মহাপ্রভুকে প্রণাম করল।

বাসায় ফিরে মহাপ্রভু অঝোরে কাঁদলেন সারাদিন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি মূর্চ্ছা গেলেন। কী বেদনা তাঁর, তিনিই জানেন। এমন বেদনা কেউ দেখে নাই। শুনেছে, রাধার বিরহ বেদনা এইরকম ছিল। দশ দশার শেষ দশা মৃত্যু। মহাপ্রভুর বুঝি সেটিই বাকী। কোনরকমে রাত কাটল।

নিশিভোরে সকলে দেখল মহাপ্রভু শয্যায় নাই। এত সকালে তিনি কোথায় গেলেন? স্বরূপ আদি ভক্তগণ খোঁজাখুঁজি করে। মহাপ্রভু মন্দিরের সিংহদ্বারে পড়ে আছেন, চেতনা নাই। আর

শরীরের যাবতীয় অস্থিসন্ধি শিথিল। হস্তপদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত, একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত।

মহাপ্রভু চেতনা পেয়ে ইতি উতি তাকান।

*

শরতের স্বচ্ছ নিশীথ। আকাশে অগণ্য তারা, ধরাতল কৌমুদী ধারায় ধোয়া। কোথাও কোন মলিনতা নাই।

মহাপ্রভু বেলাভূমিতে পদচারণা করছেন, মাঝে মাঝে দেখছেন সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ। অবিরাম। সহসা তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। কেন করলেন, কেউ জানে না।

ভক্তগণ সমুদ্র প্রবেশ লক্ষ্য করে নাই, সুতরাং হতচকিত। প্রভু কোথায়? প্রভু কোথায়? রজনীর তৃতীয় প্রহর, প্রভুর দর্শন নাই।

অতি প্রত্যূষে এক ধীবর সংবাদ দিল। মহাপ্রভু বেলাভূমিতে শয়ান, দেহে জীবনের সাড়া নাই।

মহাপ্রভু এমন দুর্বল যে, তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে হয়। কোনরকমে হাঁটছেন, পা দুর্বলতায় কাঁপে। বাসুদেবের পদ আছে: অতি দুরব দেহ ধরা নাহি যায়, আছড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমি গড়ি যায়।

শরীর দুর্বল আর মন ব্যাকুল। নরহরির পদ আছে: গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়, জাগিয়া রজনী পোহায়। খেনে খেনে করয়ে বিলাপ, খেনে রোয়ত, খেনে খেনে কাঁপ। মহাপ্রভুর ঘুম নাই, জেগে রাত কাটান। ক্ষণে ক্ষণে বিলাপ করেন, কাঁদেন, কেঁপে ওঠেন। এমনই বিরহ তাঁর।

স্বরূপ দেখলেন, মহাপ্রভুর নাকে ক্ষত, রক্ত পড়ছে। কি করে হল জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—মনে বড় উদ্বেগ, ঘরে থাকতে পারি না। অন্ধকারে দরজা খুলতে গিয়ে আঘাত লেগেছে। স্বরূপ আর তাঁকে একলা শুতে দিল না। তাঁর কাছে রইল শঙ্কর। সে মহাপ্রভুর পা দুখানি বুকে করে শুয়ে থাকে।

এভাবেই দিন যায়।

[পাঁচ]

দিনে দিনে দীর্ঘ বারো বছর কাটল বিরহযন্ত্রনায়। চরিতামৃতে আছে: শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হয় নিরন্তর।

মহাপ্রভু বারো বছর নীলাচলে নিজ গম্ভীরায় কাটালেন। তীর্থ পর্যটন করলেন না। জননী জন্মভূমি দর্শন করলেন না। শচীমাতার মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করল না। একাকিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ চিন্তা করলেন না। গম্ভীরায় বসে থাকেন। জাগরণে যায় বিভাবরী। আহা মরি!

মহাপ্রভু মুখে মুখে শ্লোক রচনা করলেন: ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে, মম জন্মনি জন্মনাৎ ঈশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিঃ অহৈতুকী ত্বয়ি। তিনি ধন জন সুন্দরী কবিত্ব চান না। চান অহেতুকী ভক্তি। তাঁর ভক্তির কোন হেতু থাকবে না। ভক্তির জন্য ভক্তি। তাঁর সকল কাজে স্বতঃই কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হবে।

মহাপ্রভু ধীরে ধীরে প্রচারকের ভূমিকা থেকে বিদায় নিচ্ছেন। গৌড়ভূমে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য রয়েছে, কাশীতে মিশ্র ও সরস্বতী, বৃন্দাবনে জীব রূপ সনাতন, নীলাচলে স্বরূপ ও সার্বভৌম। ওরা প্রেম-ধর্মের সক্ষম ধারক ও বাহক।

হেনকালে গৌড়ভূমি থেকে অদ্বৈতাচার্যের বারতা এল। মহাপ্রভু, তোমার কাজ শেষ হয়েছে। তোমার ছুটি। মহাপ্রভুর আনন্দ ধরে না। ছুটি যখন পেয়েছেন তখন আর কী?

*

মহাপ্রভু বরাবর গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করেন।

ভেতরে গেলে পাণ্ডা ঠাকুররা অসন্তুষ্ট হয়। আজ ধর্ম ব্যবসায়ীদের উপেক্ষা করে তিনি অভ্যন্তরে গেলেন।

চৈতন্যমঙ্গলে আছে ঃ আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে, নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে। তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে, জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে। এ কেমন ঘটনা? মন্দিরের কপাট বন্ধ, ভক্তগণ ঘটনা কেমন দেখল না। চৈতন্যমঙ্গলে আছে সে কথা। গুঞ্জাবাড়িতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ, কি কি বলি, সত্বরে সে আইল তখন। সে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল—শুন হে পড়িছা! ঘুচাও কপাট দেখি বড় ইচ্ছা।

কপাট খোলা হল কিন্তু ঘটনা দেখা গেল না। তখন রটনা হল ঃ গুঞ্জাবাড়ির মধ্যে প্রভু হৈলা অদর্শন।

এরপর ভক্তগণ নীলাচলে তিষ্ঠোতে পারল না। তারা বৃন্দাবন গেল।

———

শ্রীরামকৃষ্ণ

এক

কামারপুকুরের খুদিরাম চাটুজ্যের স্ত্রী চন্দ্রমণির দুই ছেলে এক মেয়ে। চোদ্দ বছর বয়সে রামকুমার, উনিশ বছরে কাত্যায়নী, সাতাশ বছরে রামেশ্বর, তারপর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে এই আবার। আঠারো বছর পর।

চন্দ্রমণি গর্ভব্যথা উঠলে ঢেঁকিশালে গিয়ে শুলেন। বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন খুলে তিনি জন্ম দিলেন এক বিশাল প্রাণ। তখন শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়া তিথি, রাত্রি একত্রিশ দণ্ড। বুধবার, সতেরোই ফেব্রুয়ারী, আঠারশো ছত্রিশ সাল।

শীতের রাতে আঁতুর ঘর হিম। ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়ে ধনী কামারনী শাঁখ বাজালেন, উলু দিলেন। প্রতিবেশিনীরা ছুটে আসে। কী হয়েছে ?

ছেলে। সুন্দর ফুটফুটে। ধাই নাড়ী কাটলেন এবং প্রতিবেশিনী প্রসন্নময়ী মঙ্গলাচরণ করলেন।

নবজাতক মা-র বুকের কাছে নিশ্চিন্ত ঘুমোয়।

শিশু জন্মেই বেশ বড়সড়। সুস্থ সবল এবং সদাই প্রফুল্ল বদন। সদাই স্তনদায়িনী মা-র কোলে শুয়ে পুটপুট করে তাকায়, ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে। চন্দ্রমণি সকল দুঃখ ভুলে যান। সাংসারিক অভাবের কথা, দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে থাকে না।

একদিন গদাধর অনেকক্ষণ মা-র স্তন্যপান করল। পেট ভরলে ঘুম। চন্দ্রমণি মশারির ভেতর শিশুকে শুইয়ে গেরস্থালি কাজ করছেন, মন পড়ে আছে ছেলের কাছে। খাট থেকে পড়ে যাবে না তো ?

চন্দ্রমণি ঘরে এসে দেখেন মশারির ভেতর এক বিশাল পুরুষ। তিনি ভুল দেখেন নাই। দেখেছেন ঠিকই তবে ভাবের দেখা। কালিদাস মেঘের দিকে তাকিয়ে যেমন বপ্রক্রীড়ায় পরিণত গজ দেখেছিলেন, তেমনি।

তা গদাধর বিশাল পুরুষ না হলেও বেশ ডাগর ডোগর হয়েছে। যা হয়েছিল তার ডবল। মা চন্দ্রমণি একবার ভাবলেন, গদাই খুব বড় হবে।

*

পাঁচ বছর বয়েসে গদাধরের হাতে খড়ি হল। পাঠশালায় গেল লেখাপড়া করতে। প্রহ্লাদ চরিত্র, দাতাকর্ণ হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান বেশ পড়ে কিন্তু যোগ বিয়োগ ঠিক রাখ পারে না। গণিতে তেমন মাথা নাই।

গদাধরের যাত্রাগানে বড় রুচি। কামারপুকুরে যাত্রাগান হলে গদাধর প্রসন্নদাসী অথবা ধনীদাসীর হাত ধরে আসরে উপস্থিত। বিভোর হয়ে অভিনয় দেখে, গান শোনে। বছর খানেক পর গদাধর একটা যাত্রাদল গড়ল। পাঠশালার সব পড়ুয়া একেবারে মেতে গেল গো, দিনে স্বরে অ স্বরে আ করে, আর রাত্রে করে পালাগান।

চন্দ্রমণি, ক্ষুদিরাম ও প্রতিবেশীজন গদাধরের অভিনয় দেখে আনন্দ পায়। কতই আনন্দ তার নাহি নিরূপণ। বেশ গাইতে পারে তো। বলিহারি।

গদাধর বড় ডাকাবুকো। ভয় ডর নাই। পিসীমা রামশীলার উপর শীতলার ভর হয়েছে। তিনি আবোল তাবোল বকছেন। সবাই সন্ত্রস্ত আর ও কিনা বলে—পিসীমার ঘাড়ে কেন? আমার ঘাড়ে চাপো তো দেখি।

চন্দ্রমণি কেঁপে ওঠেন। এ কি কথা ছেলের!

ছেলের কথা অনেক! গদাধর শ্মশানে-মশানে একা ঘুরে বেড়ায়।

আর পুকুরে মেয়েদের ঘাটে দস্যিপনা করে। এক রমণী বিরক্ত হয়ে বললেন—কাপড় ছাড়ব। সরে যা!

—না, সরব না।

—মেয়েদের শরীর দেখতে নাই।

—কেন নাই?

বলে গদাধর দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। রমণীগণ কোন রকমে গদাধরকে বিদায় করলেন।

তিনদিন পর গদাধর হাসি-হাসি উপস্থিত। বলল—লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছি।

লজ্জিতা রমণী মৃদু অভিযোগ করলে চন্দ্রমণি গদাধরকে বললেন—মেয়েরা আমারই মতন।

—সবাই?

—সবাই।

গদাধরের চোখের মণি নড়ল। সব মেয়েই মায়ের মতন। মায়ের আবার শরীর দেখব কী!

গদাধর মেয়েদের ঘাটে যাওয়া ছাড়ল।

*

সাত বছর বয়সে গদাধরের এক কাণ্ড।

আষাঢ় মাস! আকাশে শ্যাম গম্ভীর মেঘ। আর সেই কালো মেঘের কোলে সিত-পক্ষ বলাকা উড়ে যায়। গদাধরের মনে হল গতির আবেগে বিশ্বচরাচর দুলছে। তরুলতা, মাঠ-ঘাট, ঘর-বাড়ি সবই অস্থির। এ কি অস্থিরতা। ওই বকের মত উড়ে যাবে নাকি গো?

গদাধর অনুভূতির তীব্রতা সইতে পারে না, পড়ে যায়। দেখতে পেয়ে ধনী কামারণী ওকে তুলে নিয়ে এলেন। চন্দ্রমণি মুখে চোখে জলের ছিটা দিলে জ্ঞান ফিরল বালকের। বলল—মা, আমার কিছু হয় নি। খুব ভাল লাগছিল।

—কি রকম ভাল ?

—সে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।

চন্দ্রমণি চিন্তিত। ক্ষুদিরামও। তাঁরা ছেলের পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করলেন।

মহানন্দে গদাধর খেলা করে, পাড়া বেড়ায়, পালাকীর্তন শোনে।

সাত বছর বয়েসে গদাধর বাবাকে হারাল। এখন দাদাই অভিভাবক। তাঁর কথামত গদাধর আবার পাঠশালায় যায় কিন্তু লেখাপড়া ভাল লাগে না। পালাকীর্তনেই বালকের অনুরাগ। খুব মন দিয়ে গান শোনে আর একবার শুনলেই গলায় গান এসে যায়।

গ্রামের কতিপয় স্ত্রীলোক বিশালাক্ষীর পূজো দিতে চলেছেন। গদাধর প্রসন্নমাসীকে ধরল, সেও যাবে। প্রসন্ন খুব ভালবাসেন গদাইকে, সঙ্গে নিলেন। বালক মেঠো পথে তার মাসীকে গান শোনায়। কি গান ! হৃদয় জুড়িয়ে যায় সকলের।

সহসা গদাধরের কি যে হল, ঠোঁট নড়ে না। অবশ শরীর। আর হাপুস নয়নে কাঁদে। প্রসন্ন কি যে করবেন ভেবে পান না, ব্যাকুল হয়ে মা বিশালাক্ষীকে ডাকেন, পূজোর ভোগ খাওয়ান।

*

গদাধরের পৈতে ঠিক হল। ও দাদাকে জানাল, ধনী মাসীর হাতে প্রথম ভিক্ষা নেবে। দাদা মাথা নাড়লেন। ধনী কামারের মেয়ে, তা হয় না। হয় না ? গদাধর ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল। কত লোক গদাধরকে বোঝায়। ও খিল খোলে না। অভুক্ত শুয়ে থাকে।

যবে ভাই রামেশ্বর যাইয়া আপনি, বলিলেন ভিক্ষা দিবে ধনী কামারিনী। না হয় হইবে নষ্ট বংশ কুলাচার, শুনি বাণী তবে মুক্ত করিলেন দ্বার।

উপবীতধারী দ্বিজ গদাধর ধনী কামারনীর দ্বারে করাঘাত করে—মা, ভিক্ষা দাও।

ধনীর দু'চোখ বেয়ে নামল আনন্দাশ্রু ধারা। অন্যান্য রমণীদেরও চোখ সজল।

কামারপুকুরের রমণীকুল কিশোর গদাধরকে বড়ই ভালবাসে। আর গদাধরও রমণীজন মাঝে মহাসুখী। কোন মাসী আদর করে জিলিপি খাওয়ালেন, কোন পিসী যোগাছার পালা কিনে দিলেন। গদাধর জিলিপি খেয়ে যোগাছার পালা সুর করে পড়েঃ যে ভয়ে পালাও তুমি, সে মা যোগাছা আমি।

পড়ার পর ব্যাখ্যা। গদাধর এমন সুন্দর জগন্মাতার মহিমা ব্যাখ্যা করে যে শ্রোতাকুল ধন্য ধন্য করে। ধন্যি ছেলে।

সীতানাথ পাইনের আট কন্যা। তাদের কয়েকজন যুবতী। তাই কথা উঠল। বাড়িতে অতগুলি যুবতী, গদাধরও এখন প্রায় যুবক। ওর আর বাড়িতে না আসাই ভাল। সীতানাথ বললেন, গদাধরকে খুব চিনি। কোন ভয় নাই।

গদাধরের যাওয়া-আসা অব্যাহত। গান করে, কথকতা করে, রঙ্গ রসিকতা করে। নারীগণ মুগ্ধমন দেখি গদাধর, একে একে কুড়ি দরে হয় একত্তর। কিন্তু দুর্গাদাসের বাড়ির মেয়েরা আসে না। কর্তার বারণ। একথা শুনে গদাধর একদিন দুর্গাদাসকে বলল· বাড়িতে আটকে রেখে কি মেয়েদের রক্ষা করা যায়?

—নিশ্চয় যায়।

—বেশ। তুমি কেমন রক্ষা কর দেখি।

গদাধর সীতানাথের বাড়ি গেল।

দিনকয়েক পরের কথা। সন্ধ্যেবেলায় দুর্গাদাসের বাড়ির মেয়েরা বিরসবদনে ঘরে বসে আছে। তাঁতি-বৌ শাড়ি গামছার চুপড়ি নিয়ে হাজির। সন্ধ্যেবেলায় কেন? তাঁতি-বৌ ঘোমটা টেনে বলল—আজ

আর গাঁয়ে ফিরতে পারবুনি গো, রাতটা তোমাদের ইখানেই থাকতে দাও।

—তা থাক। দুর্গাদাসগৃহিণী ঢেঁকিশালটা দেখিয়ে দিলেন—ওইখানে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়।

তাঁতি-বৌ এককোণে জড়সড় হয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর সুখ দুঃখের কথাবার্তা হয় গৃহিণী ও তাঁর কন্যাদের সঙ্গে। যখন এক প্রহর গত, পথে ডাক শোনা গেল। কে যেন ডাকছে : গদাই, গদাই।

তাঁতি-বৌ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল এবং পর মুহূর্তেই দাদাগো—বলে ভেতর বাড়ি থেকে এক ছুট। চীৎকার শুনে দুর্গাদাস বৈঠকখানা থেকে হাঁকলেন—কে রে?

—আমি গদাধর। তোমার মেয়েদের সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করে গেলাম।

—ওমা! দুর্গাদাসগৃহিণী গালে হাত দিলেন—গদাধর বেশ তাঁতি বৌ সেজেছিল তো! আমরা বুঝতেই পারিনি, এ আমাদের গদাই!

কৃষ্ণযাত্রায় গদাধর অপরূপ রাধা সাজে। কে বলবে মেয়ে নয় ছেলে। যেমন হাবভাব, তেমনি চলন বলন। ওর অভিনয় দেখে সবাই মুগ্ধ।

গদাধর একটি যাত্রাদল গড়ল। সেইদল দুপুরবেলা আমবাগানে কালীয়দমন অভিনয় করে। পথিকেরা বসে পড়ে অভিনয় দেখে, গান শোনে, কাজের কথা ভুলে যায়। যে টাকার যোগাড়ে বেরিয়েছিল, তার টাকা যোগাড় হল না। যে পাত্রের সন্ধানে বেরিয়েছিল তার পাত্রের সন্ধান হল না। তবু মন ভরে যায়। এমন যাত্রাগান।

সহসা গদাধর তার সঙ্গীদের সখের যাত্রাগান বন্ধ করে দিল। কি যে হয়েছে ওর, একা একা ঘুরে বেড়ায়। চিন্তাতুর, মুখের ভাব উদাস উদাস।

গদাধর শেহড়ে দিদির কাছে গেল। হেমাঙ্গিনীর মেজ ছেলে হৃদয়

মামার খুব ভক্ত। সর্বদা পেছনে পেছনে ঘোরে, ফাইফরমাস খাটে আর ভালও বাসে। হৃদয় বলল—মামা আমি তোমার সেবা করব।

—আমার ?

—হাঁ তোমার। হৃদয় চোখ তুলে তাকাল—তুমি গুরু, আমি চেলা।

—আমি বাপু গুরু হতে পারবনি।

—ঠিক পারবে। শ্রীনিবাস কি বলেছে জান ?

—কি বলছে ?

—গদাধরের ভেতর ঝড় উঠেছে। ও সংসারী হবে না।

গদাধর মুড়ি খাচ্ছিল, হাত আর চলে না। চোখের সামনে ভাসছে গেরুয়া বসন, ভিক্ষাপাত্র হাতে সন্ন্যাসী।

হৃদয় চুপি চুপি উঠে গিয়ে মাকে নিয়ে এল। হেমাঙ্গিনী গদাধরের তদ্গত অবস্থা নিরীক্ষণ করলেন। লোকে ঠিক বলে। গদাধর ধ্যান-সিদ্ধ। তিনি একবার দুবার তিনবার ডাকলেন, সাড়া নাই।

চেতনা ফিরে এলে গদাধর ইতি উতি চায়। হেমাঙ্গিনী নিবিড় স্নেহে ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরলেন—গদাই।

—দিদি।

—কি হয়েছে তোর ?

—কি জানি! মনে হয় ঘর সংসার করা আমার হবে না। কে যেন মাঝে মাঝেই আমাকে বলে ঃ একটা দাগ রেখে যা। এমন করে বলে যে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

হৃদয় এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, এবার মুখ খুলল।

—মামা, আমি জানি তুমি গুরু হবে। তা বাপু তখন আমাকে ভুলে যেও না।

গদাধর ক্ষীণ হাসল।

*

রামকুমার কলকাতা থেকে কামারপুকুর এসেছেন। তিনি গদাধরের

লেখাপড়ায় অমনোযোগ দেখে চিন্তিত। বামুনের ছেলে লেখাপড়া না শিখলে যজন যাজন কীভাবে করবে? ঠিক হল গদাধর তাঁর সঙ্গে কলকাতায় যাবে। কাছে থাকলে তাঁর চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনা করতে পারবে গদাই।

গদাধর দাদাকে গেরস্থালি কাজে সাহায্য করে, কিন্তু লেখাপড়া করে না। রামকুমার তিরস্কার করলেও সোজাসুজি বলল—চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না।

—ঠিক আছে। রামকুমার হাতের পুঁথিতে মন দিলেন—যা শিখতে চাস তাই শেখ।

গদাধর নিখুঁত প্রতিমা গড়তে শেখা সুরু করল। গান জানে, যাত্রা করতে পারে, প্রতিমা গড়তেও শিখছে। আবার কী চাই?

গদাধর কলকাতা ভাল না লাগলে কামারপুকুরে মার কাছে যায়, শিহড়ায় দিদির কাছে যায়। বেশ দিন কাটে।

[দুই]

আঠারশো পঞ্চান্ন সাল। কালীপদ অভিলাষী রাসমণি গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে কালীবাড়ী বানালেন। দেবী ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা হল, পুরোহিত রামকুমার। তিনি কলকাতার চতুষ্পাঠী তুলে দিয়ে দক্ষিণেশ্বর এলেন, সঙ্গে গদাধর।

নবরত্ন শিখর মন্দির, পঞ্চবটী উদ্যান, গঙ্গার ঘাট গদাধর ঘুরে ঘুরে দেখল। কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, যাত্রাগান গদাধর দিনেরাতে শুনল। দেখে শুনে খুব খুশী। আহা! কি মন্দির গো যেন রজত-গিরি। আর স্থানটিও তেমনি, কূর্মপৃষ্ঠ শ্মশান। কৈবর্তের বেটি একটা মহৎ কর্তব্য করেছে।

রাণী রাসমণি গদাধরকে দেবীর বেশকারীর কাজ দিতে চাইলে রামকুমার বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। গদাধরের যে রকম মনের অবস্থা তাতে পরের চাকরী করতে পারবে কী?

গদাধর ঠাকুর বায়ুর মত স্বাধীন, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। নিত্যসঙ্গী হৃদয়। ও শেহড় থেকে চাকরীর খোঁজে দক্ষিণেশ্বর এসেছে। গদাধর রাঁধতে বসলে চাল ডাল জোগাড় দেয়, নাইতে গেলে তেল গামছা সঙ্গে নেয়, খেয়ে শুলে পাখা করে।

গদাধর গঙ্গামাটি দিয়ে পরিপাটি শিবঠাকুর গড়ল। ঠাকুরের বাহনটির কী গতর, যেন ধর্মের ষাঁড়।

রাণীর জামাই মথুর মূর্তি ও মূর্তিশিল্পী উভয়কে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মূর্তিটি নিয়ে চললেন রাণীমার কাছে।

রাণী বললেন—মথুর, ঠাকুর সাধারণ মানুষ নয়। যেমন শিল্পীর হাত, তেমনি গায়কের গলা। তুমি ওর গান শুনেছ?

—না।

—একদিন শুনো। রোমাঞ্চ হবে।

রাণী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি শূদ্রানী তাই ঠাকুর হাত পুড়িয়ে রাঁধে, মন্দিরের অন্নভোগ খায় না।

মথুর নিজেই চললেন ঠাকুরকে মূর্তিটি ফিরে দিতে কিন্তু যাওয়া হল না। মন্দিরের কাজে আটকা পড়লেন

ভৃত্য ডাকতে এলে গদাধর গাঁইগুঁই করে, যেতে ইচ্ছা নাই। হৃদয় বলল—কী হল মামা? যাও।

— কী করে যাই। গদাধর অসহায় তাকায়—গেলেই রাণী আমাকে চাকরী দেবে।

—ভালই তো। চাকরী করবে। মাইনে নিশ্চয় খারাপ দেবেনি।

—সে কথা নয় হৃদু, চাকরী আমি করতে পারবনি।

—কেন?

—দেবার অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার। আমি তার দায়ী থাকতে পারব নি। তুই প্যারবি?

হৃদয় মাথা হেলিয়ে দিল

মামা ভাগনে যুক্তি করে গেল মথুরবাবুর কাছে। তিনি মূর্তিটি ফিরে দিয়ে বললেন—ঠাকুর, তোমার নামটি কী যেন?

—শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

—তা রামকৃষ্ণ, তোমার সঙ্গে কে?

—আমার ভাগনে হৃদয়।

— বেশ।

বলে মথুর চাকরীর কথা পাড়লেন। গদাধর বললেন মনের কথা। মথুর হাসলেন—তাই হবে। তোমাকে আগলদারি করতে হবে না।

*

রামকৃষ্ণ ভবতারিণী দেবীর মন্দিরে ছিলেন বেশকারী, হলেন পূজারী। সবই মায়ের ইচ্ছা। মা কে? ভবতারিণী আর রাসমণি। সাধক রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তিমতী রাসমণির অবদান অনেকখানি।

রাণী রাসমণি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর আসছেন। তাঁর বড় দুঃখ ঠাকুর মন্দিরের অন্নভোগ গ্রহণ করেন না। এ দুঃখ জানাতে রামকৃষ্ণ বললেন —তা কি হয়েছে রে। রাতে তো পেসাদী লুচি খাই।

রাণী রাসমণি খাওয়া নিয়ে কথা বাড়ালেন না। বললেন—ঠাকুর ওই গানটা গাও।

—কোন গানটা?

—ওই যে। রাসমণি তদ্গত উচ্চারণ করেন—কোন হিসাবে হর হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে। সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে।

রামকৃষ্ণ গান করছেন আর রাণী ভাসছেন নয়নের জলে

আর একদিন কিন্তু কাণ্ড হবে।

রামকৃষ্ণ দাদার খাটে বসে আছেন। রামকুমার কিছুদিন যাবৎ শারীরিক অসুস্থ। রামকৃষ্ণের মনে হল স্থান পরিবর্তন করলে শরীর ভাল হবে। তিনি সেকথা বললেন। রামকুমার ছুটি নিয়ে কামারপুকুর চলেছেন, পথে মৃত্যু হল।

দাদার মৃত্যুতে রামকৃষ্ণের মাথার ওপর কেউ রইলেন না। তিনি সামান্য বিচলিত বোধ করছেন। হৃদয় বলল—রাণীর আশ্রয়ে আছি। ভয় কী?

আশ্রয়ের ভয় নয়। রামকৃষ্ণ কাজ ভালই শিখেছেন। কিছুদিন আগে রাণী রাসমণি শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্যকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কালীপূজারী রামকৃষ্ণ দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছে। তিনি বিধিমত অঙ্গন্যাস করেন, মন্ত্রপাঠ করেন, আরতি করেন। পূজোয় গভীর মনোনিবেশ।

তবু রামকৃষ্ণ বিচলিত। কারন চেতন মন ভরে নাই। তিনি গভীর রাতে পঞ্চবটীর জঙ্গলে পরিধেয় বস্ত্র ও উপবীত ত্যাগ করে কালীর ধ্যান করেন। আমলকী তলায় ধ্যান করলে সিদ্ধ হওয়া যায় তাই আমলকী গাছের নীচে আসন।

এক রাতে হৃদয় চুপিচুপি এল আমলকী তলায়। মামার কাণ্ড দেখে রাগারাগি করল কিন্তু রামকৃষ্ণ অনড়।

কঠোর সাধনায় রামকৃষ্ণের জ্যোতি দর্শন হল। দর্শনের পর তিনি রোদন করেন—দেখা দে মা। দেখা দে।

জ্যোতি নয় ঈশ্বরীর দর্শন চান।

*

রামকৃষ্ণ কালী দর্শনের আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। মন্দিরের কাজ কোনপ্রকারে হৃদয় সারে। যা নিজে পারে না তা অন্য ব্রাহ্মণকে দিয়ে করায়। এক একদিন রামকৃষ্ণ মন্দিরে যান, গিয়ে অনর্থ করেন।

অভিযোগ গেল। রাণী রাসমণি নিজের চোখে দেখলেন, ঠাকুর ভবতারিণীর সিংহাসনে বসেছেন, দেবীর চিবুক ধরে আদর করছেন। ভোগ দেবীকে খাওয়াচ্ছেন নিজেও খাচ্ছেন। ভাব দেখে ঠাকুরের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বললেন—এতদিনে মন্দির সার্থক।

আদেশ এল, ঠাকুরের কাজে কেউ বাধা দেবে না। তিনি যেমন খুশী পুজো করবেন।

রাসমণি না হয়ে আর কেউ যদি রাণী হতেন রামকৃষ্ণের কী হত মা কালীই জানে!

রামকৃষ্ণ পূজো সেরে রাণীকে গান শোনাচ্ছেন। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান। ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন···

রাণী চক্ষু মুদি শুনছেন, হঠাৎ এক কাণ্ড। ঠাকুর গান বন্ধ করে রাণীর গালে একটি চড় মারলেন—কেবল বিষয় চিন্তা?

ভৃত্য ও অনুচরগণ চঞ্চল হয়ে উঠলে রাসমণি ঠাকুরের দিকে অপরাধিনীর চোখে তাকালেন। যথার্থই তিনি মন্দিরে এসে মোকদ্দমার কথা ভাবছিলেন। বললেন—ঠাকুরের কোন দোষ হয় নাই। তোমরা যাও।

ঠাকুরের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে রাসমণি ও মথুরের সবিশেষ লক্ষ্য। বায়ুর ধাত বলে মিছরির পানার ব্যবস্থা হয়েছে, এবার কলকাতার গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে বলা হল, ভাল করে ঠাকুরের চিকিৎসা করুন।

তা কবিরাজ চিকিৎসা আর কী করবেন। ঠাকুরের যা রোগ তার কবিরাজী চিকিৎসা নাই। বিষ্ণুতেল ঘৃতকুমারী সত্বেও বায়ু কুপিত।

রামকৃষ্ণ ক্ষণে সুস্থ ক্ষণে অসুস্থ। তাই রাণী ঠাকুরের খুড়তুতো ভাই রামতরনকে ভবতারিণীর পূজারী নিযুক্ত করলেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু রয়ে গেলেন। অধীনে স্বাধীন। ইচ্ছা হলে পুজো করেন ইচ্ছা না হলে করেন না।

মথুরের কেমন ভয় হয়। ভাবের বাড়াবাড়ি ভাল না। ঠাকুর পাগল

হয়ে যাচ্ছেন না তো? বুঝিয়ে বলার মত বললেন—ঠাকুর, একটু নিয়ম মেনে চল।

—আমি নিয়মের ধার ধারি না।

—আহা! এই বিশ্বসংসার অমোঘ নিয়মে বাঁধা। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন নিয়ম মেনে। তাঁর নিয়ম তিনিও ভাঙ্গতে পারেন না!

—ও কী কথা। তিনি তাঁর নিয়ম ইচ্ছা করলেই ভাঙ্গতে পারেন।

বলে রামকৃষ্ণ চলে গেলেন।

পরদিন মথুর দক্ষিণেশ্বর এলে রামকৃষ্ণ একটি জবাডাল নিয়ে উপস্থিত।

—দেখ গো, নিয়মভঙ্গ দেখ। রামকৃষ্ণ ডালটি মথুরের হাতে দিলেন—একই ডালে লাল আর সাদা ফুল।

মথুরের চোখ বিস্ফারিত। অবাক কাণ্ড ভাই, এমন ব্যাপার তো কখনও জন্মে দেখি নাই। একই ডালে দুধের মত সাদা আবার রক্তের মত লাল জবা। তিনি ডালটি নিয়ে রাণীমার কাছে গেলেন।

সব শুনে রাসমণি প্রণাম করলেন ঠাকুরের উদ্দেশে। উজ্জ্বল কর, ঠাকুর সনাতন ধর্মের মহিমা উজ্জ্বল কর। নিরস্ত কর বিদেশী মিশনারীদের।

*

রামকৃষ্ণ ধ্যানে বসেছেন, কে যেন বলল—বাজে চিন্তা যদি না ছাড়বি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসিয়ে দেব।

রামকৃষ্ণ কেঁপে উঠলেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তিনি আর কোনদিন বাজে চিন্তা করবেন না। ওসব কথা মনে হলে মনের টুঁটি টিপে ধরবেন।

কয়েকদিন পর রামকৃষ্ণের রক্ত বমি হল। সিমপাতার রসের মত

কালো রক্ত। কিছু রক্ত জমে গিয়ে বটের ঝুরির মতন। দেখে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন, অস্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য পালনে বীর্যের বিকার ঘটে এবং সেহেতু রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়

একথা রাসমণির কানে গেল এখন কী আছে উপায়? কী উপায়ে ঠাকুরকে [illegible] চানো যায়? তিনি ঠাকুরের বিয়ের কথা তো চিন্তা করলেনই, তা বাদে এক কথা চিন্তা করলেন

কলকাতা থেকে দুজন রূপসী যুবতী এসেছে দক্ষিণেশ্বর [illegible] তারা ঠাকুরের কাছে এল তাদের দেখে রামকৃষ্ণ পুলকিত হলেন এযে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো [illegible] তুমি কে গা?

—তোমার সেবাদাসী

—অ [illegible] বলে তিনি শ্যামাসঙ্গীত ধরলেন আর দুই যুবতী হলো আকুল। ভুলে গেল। পুঁথিতে আছে সুগন্ধিক [illegible] সঙ্গীত শুনি, বেদের [illegible] নাগিনী সকালে এবং কলকাতা ফিরে গেল।

[illegible] বললেন বিয়েই [illegible]

*

চন্দ্রমণি একই কথা বললেন রামেশ্বরকে

মেজদাদা দক্ষিণেশ্বর গিয়ে রামকৃষ্ণকে বাড়ি নিয়ে এল বিয়ের ক[illegible] হয়, পাত্রীর খোঁজ চলে রামকৃষ্ণ সংবাদ পেয়ে কোন বাধা দিলেন না। তাহলে বিয়ের কথা [illegible] সি, কথায় উত্তর দেন মৃদুমন্দ হাসি।

আঠারোশো উনষাট সাল বৈশাখ মাসে রামকৃষ্ণের বিয়ে হল সারদামণির সঙ্গে বরের বয়স চব্বিশ আর কনের বয়স ছয়।

বউ নিয়ে রামকৃষ্ণ বাড়ি ফিরলেন ধনী কামারিণী প্রসন্নময়ী উলু দিলেন ধনী বললেন—আহা! বেশ মানিয়েছে দুজনকে. যেন লক্ষ্মীনারায়ণ।

রামকৃষ্ণের খেয়ে শুয়ে আয়েসের দিন কাটছে। সারদার সাত বছর হওয়ার মুখে তিনি শ্বশুরবাড়ি গেলেন। ফিরলেন জোড়ে। পালকিতে বউকে বললেন—কেউ যদি তোমার বয়েস জিজ্ঞেস করে পাঁচ বলবে, সাত বোলো নি।

সারদা মাথা হেলিয়ে দিল।

*

দেড় বছর পর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ফিরে এলেন। তিনিও এলেন আর রাণী রাসমণি মারা গেলেন। মারা যাবার ঠিক একদিন আগে রাণী করে গেলেন অতি মহৎ কাজ।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ির ব্যয় নির্বাহের জন্য দিনাজপুর জেলার তিনলাট জমিদারি দানপত্রের দ্বারা দেবোত্তর সম্পত্তি করে দিয়ে গেলেন। অপুত্রক রাণীর দুই জীবিত কন্যার একজন সই করল আর তিনি করলেন। পরদিন রাণী গঙ্গাজলে অঙ্গ রেখে বললেন—পদ্ম যে সই দিল না, মথুর।

—সে জন্য চিন্তা নাই।

—ঠাকুরকে দেখো।

—দেখব।

রামকৃষ্ণ বকুলতলার ঘাটে বসে সব শুনলেন। শুনে উদাস। মানুষ জীবন যেন জলের ঢেউ। জীবন গঙ্গায় অবিরল অস্থিরতা। এক যায় আর এক আসে।

*

এক রূপযৌবনবতী ভৈরবী দক্ষিণেশ্বর এসেছেন। কাকে যেন খুঁজছেন তিনি। ঠাকুরকে দেখে স্মিত হাসলেন—বাবা, তুমি এখানে।

—আমাকে চেন না কি গো?

—বিলক্ষণ।

ভৈরবীর হাসিমুখ দেখে রামকৃষ্ণ ভরসা পেলেন। মাকে দেখলে ছেলে যেমন পায়, তেমনি।

বললেন—হাঁ গা, আমার কী হয়েছে? বুক জ্বালা করে, ঘুমোতে পারি নি। আবার মূর্চ্ছা যাই। এ কোন ব্যাধি?

—ব্যাধি নয়, বাবা। এ মহাভাব, শ্রীচৈতন্যেরও হয়েছিল। তিনি যেমন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তোমাকেও সেইরকম আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

—তা কী আমি পারব?

—নিশ্চয় পারবে। তুমিই শ্রীচৈতন্য। তুমি আর একভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

রামকৃষ্ণ কেঁপে উঠলেন।

ভৈরবী যোগেশ্বরী বিধিমতে রামকৃষ্ণকে তন্ত্রসাধনায় ব্রতী করলেন। চৌষট্টি তন্ত্রে যা কিছু আছে সবই করতে হবে, কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না। তবে সিদ্ধি।

অমাবস্যার রাত। পঞ্চবটীর জঙ্গলে পঞ্চমুণ্ডির আসন। সাপ, ষাঁড়, কুকুর, শেয়াল আর মানুষের মুণ্ড আসনের তলায়। উপরে উপবিষ্টা নগ্ন শরীর যুবতী। যোগেশ্বরী আদেশ করলেন—যুবতীর পূজা কর।

রামকৃষ্ণ ষোড়শ উপাচারে পূজা করলেন। সাঙ্গ হলে ভৈরবী আদেশ করলেন—এবার আসনে যুবতীকে নিয়ে বস। শুধু কেবলা চিন্তা করবে তাহলে চিত্তবিকার হবে না।

রামকৃষ্ণ আনন্দাসনে বীরভাবে সমাধিস্থ। জাগ্রত কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে সহস্রার পদ্মে উঠছে। এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।

যোগেশ্বরীর নির্দেশনায় রামকৃষ্ণ তিন বছর তন্ত্র সাধনা করলেন। কী সাধনা! যোনির নাম শুনলেই ব্রহ্মযোনি দেখেন। বিশাল জ্যোতির্ময় ত্রিকোন ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। প্রসারে সৃষ্টি এবং সঙ্কোচে লয়। সৃষ্টি ও লয় জুড়ে স্থিতি।

যোগেশ্বরী রামকৃষ্ণের সাধক জীবনে গুরুস্থানীয়া। এমন নারী আর কোনও সাধকের জীবনে আসে নি। ভৈরবী যোগেশ্বরী বীরভাব শেখানোর পর মধুরভাব শেখালেন।

জানবাজারে মথুরের বাড়িতে রয়েছেন রামকৃষ্ণ। বুকে কাঁচুলি বেঁধেছেন যেন যৌবনসামগ্রী পরপুরুষে দেখে ফেলবে। ঘোমটা টেনে মথুরকে বললেন—তুমি অমন করে তাকিয়ো নি সেজবাবু, আমার লজ্জা করে।

—আচ্ছা, আচ্ছা।

বলে মথুর পাশ কাটালেন। রামকৃষ্ণ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছেন বিভোর হয়ে। মথুর হৃদয়কে বললেন—তোমার মামাকে চিনতে পারছ?

—না।

—ঠাকুর শুধু বেশভূষা নয় চলন বলনও মেয়েদের মত করে ফেলেছেন। এও এক সাধনা। বুঝেছ?

হৃদয় মাথা হেলিয়ে দিল। বুঝেছে।

রামকৃষ্ণ মথুরের স্ত্রীকে বললেন—জগদম্বা, বাড়িতে জামাই এয়েচে নিকি?

—হাঁ। কাত্যায়নীর স্বামী এসেছে।

—ছুঁড়ীকে ডাক। রামকৃষ্ণ কটাক্ষ করলেন—ও রসের কিছুই জানে না। আমি ওর কানে মন্ত্র দেব।

রামকৃষ্ণকে জগদম্বা সখির মত দেখেন। ঠাকুর পাশে শুলে তিনি হাসি গল্প করেন অসঙ্কোচে। বললেন—তুমি শিখিয়ে পড়িয়ে দাও তবে যদি কাতু মানুষ হয়।

রাত্রিবেলা রামকৃষ্ণ বসনে ভূষণে কাত্যায়ণীকে সাজালেন তারপর শোবার ঘরে পাঠাবার আগে কানে কানে বললেন—ভাতার হাত

পড়ে থাকবি না। আঁচল খসিয়ে ভাতারের হাতটা বুকের ওপর রাখবি।

সকালে রামকৃষ্ণ কোমর দুলিয়ে কাত্যায়ণীকে বললেন—কী লা, কেমন সুখ পেলি ?

কাত্যায়ণী লজ্জায় মুখ নামালে রামকৃষ্ণ হেসে গাল টিপে দিলেন—ওরে আমার নেকী।

জগদম্বা একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠাকুরের কথা শুনে হেসে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর রামকৃষ্ণ দুঃখের গলায় বললেন—তোমাদের মত আমারও পুরুষমানুষের সঙ্গে শুতে ইচ্ছা করে।

*

দুর্গাপূজা দেখে রামকৃষ্ণ জানবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর ফিরলেন। মধুরভাবে বিভোর হলেও শরীর জ্বলে যায়, লোমকূপ দিয়ে রক্ত পড়ে। যোগেশ্বরী আর হৃদয় অহর্নিশ সেবায় তৎপর। পুঁথিতে আছে: শ্রীদেহের যত্ন এবে দুজনার হাতে, ব্রাহ্মণী দিনের বেলা হৃদয় রাত্রিতে।

জানবাজারে যাবার আগে ঠাকুরের এরকম হয়েছিল, তবে অনেক কম। এখন অবস্থা এমন, কী হয় কে জানে।

যোগেশ্বরী বললেন—ভয় নাই। কৃষ্ণদর্শনের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুদিন পর রামকৃষ্ণের দেহযন্ত্রণা মিলিয়ে গেল। তখন ইন্দ্রিয় যেন মধুমুখী। তিনি চোখ মেলে তাকাতে মনে হল, তরুলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ বড়ই মধুর, কান পেতে শুনতে মনে হল তরুমর্মর, কল-কাকলী, ঝিল্লীরব বড়ই মধুর। মধু ঋতায়তে বাতা মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। সবই মধুমহাজ্ঞানের তিনি অধিকারী।

*

জননী চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বর এসেছেন। কে আছে এমন মায়ের নন্দন করিতে যতন এ সংসারে।

রামকৃষ্ণ মাকে একথা সেকথা বলছেন কিন্তু আসল কথা বলছেন না। সব সাধকেরই মাকে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা জানাতে দ্বিধা। অনুমান করে চন্দ্রমণি বললেন—আমার কথা ভাবিস নি।

দীক্ষার ব্যবস্থা হল। মথুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পঞ্চবটিতে সব আয়োজন করলেন। তারপর কী খেয়াল, হৃদয়কে বললেন—ঠাকুরের নামে একটা তালুক লেখাপড়া করে দেব ভাবছি।

এই কথা শুনতে পেয়ে রামকৃষ্ণ তেড়ে এলেন—শালা, আমাকে বিষয়ী করবি? জানিস আমার কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা।

মথুর চন্দ্রমণির কাছে গেলেন।

—ঠাকুমা!

—কী ভাই।

—সত্যি ভাই না মিথ্যে ভাই?

—সত্যি ভাই। বৃদ্ধা হাসলেন—আগড়ুম বাগড়ুম কোরো নি কী বলবে, বলে ফেল।

—হাঁ, বলেই ফেলি। সত্যি ভাইয়ের কাছে যা দরকার চেয়ে নাও।

—দরকার? চন্দ্রমণি পেটরা খুললেন—এই দেখ এতগুলো পরবার কাপড় রয়েছে।

—আরও কিছু তো দরকার হতে পারে।

—অ। চন্দ্রমণি বটুয়া বের করলেন—তল ফুরিয়েছে ভাই। এক আনার তামাক কিনে দিও।

মথুর ভক্তির চোখে তাকান। এমন মা ঠাকুরের!

*

রামকৃষ্ণ পঞ্চবটি বনে তোতাপুরী সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিলেন। ভৈরবীর মানা শুনলেন না।

তোতাপুরী আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করতে বললে রামকৃষ্ণ মনকে নির্বিকল্প করার সাধনায় তৎপর হলেন। নির্বিকল্প কী? নামরূপ

থেকে মুক্তি। নামরূপ কী? মায়াজনিত দেশকাল বোধ। মায়াজনিত অর্থাৎ মূলে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া।

রামকৃষ্ণের বড় মায়া মা-র ওপর। ধ্যান করতে বসলেই মাকে মনে পড়ে। বললেন—গুরুজী হল না।

—কেন হল না?

বলে তোতাপুরী তুই ভুরুর মাঝখানে কাচখণ্ড প্রোথিত করলেন—মনপ্রাণ দিয়ে দেখ।

রামকৃষ্ণ মনপ্রাণ দিয়ে অসীমকে দেখলেন। এ দেখা অবিশ্যি অনুভবের দেখা। দেখার পর তাঁর এক অদ্ভুত প্রতীতি হল। মায়া দয়া, দয়া মায়া। দয়া দয়া। জীবে দয়া। এখন থেকে তাঁর কাজ জীবে দয়া।

*

দক্ষিণেশ্বরে কাঙ্গালী ভোজন চলছে। মথুরের ব্যবস্থায় কৃপণতা নাই, পাতে পড়ে থাকছে লুচি মেঠাই। রামকৃষ্ণ মহানন্দে উচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন।

হলধারী উত্তেজিতভাবে বললেন—কী হচ্ছে?

—প্রসাদ পাচ্ছি

—ছোট জাতের এঁটো খাচ্ছো। যদি বলেদি, ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে না।

—তুই না বলিস কাঙালী নারায়ণ। শালা, মন মুখ এক করবি।

হলধারী পিঠ দেখালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করছেন। এঁটো পাতা তুলছেন আর বলছেন—নারায়ণ, নারায়ণ।

সহসা ঠাকুরের নজর পড়ল মথুরের ওপর।

—হ্যাঁ রা, অমন মনমরা কেন?

—ঠাকুর, জগদম্বা বুঝি বাঁচে না।

রামকৃষ্ণ মথুরের ব্যথিত মুখের দিকে তাকালেন। করুণাঘন

দৃষ্টি। আহা! মায়ায় আবদ্ধ জীব। দয়া না করলে মথুরের স্ত্রী বড় কষ্ট পাবে। দেবাবিষ্টের গলায় বললেন—জগদম্বা ভাল হয়ে যাবে।

জগদম্বা সেরে উঠলেন আর ঠাকুর রোগে ভুগলেন। এর নাম দয়া। দত্ত দাম্যত দয়ধ্বম্। তমোগুণীর ধর্ম দান, রজোগুণীর ধর্ম ইন্দ্রিয় দমন আর সত্ত্বগুণীর ধর্ম জীবে দয়া।

*

সাত বছর পর রামকৃষ্ণ বাড়ি চলেছেন। মা চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরেই রইলেন। বাড়িতে বৌমা রয়েছে, তিনি গিয়ে কী করবেন? মা-র একথা মনে হল কিন্তু ভৈরবী যোগেশ্বরীর হল না, তিনি সঙ্গ নিলেন।

ধনী কামারনী, প্রসন্নময়ী রামকৃষ্ণের বহুমুখী সাধনার কথা অল্প বিস্তর শুনেছেন। শুনে মন বড় ব্যাকুল। কত যে অমঙ্গল চিন্তা করেছেন। এখন ঠাকুরকে সুস্থ সহজ দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জয়রামবাটী লোক পাঠালেন সারদামণিকে আনতে।

সারদার বয়স এখন চোদ্দ পনেরো বছর। গ্রামীণ জল হাওয়ায় শ্যামশ্রী। আয়তনয়না, স্ফুরিত নাসা, আকুলকুন্তলা।

ভৈরবী যোগেশ্বরীকে বধূ সারদা প্রণাম করলে তিনি গভীর চোখে নিরীক্ষণ করলেন। সেই দৃষ্টিতে প্রসাদগুণ ছিল না। ছিল নারীসুলভ ঈর্ষা। হায়!

সারদা গেরস্থ বাড়ীর বউ। সারাদিন পায়ে পায়ে ঘুরছে। ঠাকুর জল চাইলে জল দিল, গামছা চাইলে গামছা। যোগেশ্বরী বললেন—তুমি ঘন ঘন ঠাকুরের কাছে যেও না।

রাত্রে সারদা ঠাকুরের পাশে শুয়ে বলল—আমি তোমার সেবা করলে তা দোষের?

—কে বলেছে?

—ভৈরবী না।

—ওঁর সব কথা তুমি শুনো নি।

সারদা ফাঁপরে পড়ল। কোন কথা শুনবে আর কোন কথা শুনবে না? ঠাকুর বললেন—ভৈরবী আমার গুরুস্থানীয়া। ওঁকে মান্য করি, তাই বলে ওঁর সব কথা শুনি না। উনি আমাকে সন্ন্যাস নিতে মানা করেছিলেন আমি শুনি নি।

—তুমি সন্ন্যাসী?

—হুঁ। ঠাকুর হাসলেন—অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধেছি। তাই বলেকি শুকনো হয়েছি?

*

রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বাল্যবন্ধু চিনু শাঁখারী। বাড়িতে আসতে কুলদেবতার প্রসাদ পেলেন চিনু। খেয়ে জায়গা পরিষ্কার করতে যাবে ভৈরবী বললেন, আমি করছি। তিনি এঁটো পাতা তুলতে গেলে বাড়ির মেয়েরা আপত্তি করল। তখন হৃদয় বলে—এঁটো পাতায় হাত দিলে তোমাকে ঘরে থাকতে দেবো নি।

—নাই বা দিলে। আমি শীতলার ঘরে শোব।

—দেখি কেমন শীতলার ঘরে শোও। হৃদয় ঢিল ছুঁড়ে মারল। ভৈরবীর কণমূল কেটে গেল, রক্ত পড়ে।

ঠাকুর ক্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন। মুখে বেদনার ছায়া। বললেন—হৃদু, এমন কাজ করলি?

সেবাশুশ্রূষার পর সুস্থ হলে ভৈরবী কাশী চলে গেলেন। আর বাড়িতে ঝগড়া হয় না। শান্তিতে ঠাকুরের দিন কাটে।

*

রামকৃষ্ণ একটু রাত থাকতে উঠেই সারদাকে বললেন—আজ ডাঁটা চচ্চড়ি কোরো গো।

সারদা রাঁধতে বসে দেখলেন, ভাঁড়ারে পাঁচফোড়ন নাই। তখন মেজ জাকে বললেন—দিদি, কী হবে?

—নাই তার কি হবে। অমনিই হোক।

ঠাকুর শুনতে পেয়ে সারদাকে ডাকলেন—সে কী গো, পাঁচফোড়ন নাই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হয়? তোমাদের ফোড়নের বেগুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?

পাঁচফোড়ন কিনে আনা হল।

খেতে বসে ঠাকুর বললেন—হৃদু, এটা যে রেঁধেছে সে রামদাস বদ্যি আর এটা যে রেঁধেছে সে ছিনাথ সেন।

শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে, এক টাকা ভিজিট, আর রামদাস বৈদ্য চিকিৎসক, ষোল টাকা ভিজিট। ছিনাথ সেন মার্কা রান্না সারদার, তাই ও লজ্জা পেল।

হৃদয় বড় চতুর। হেসে বলল—মামা, তোমার হাতুড়েকে তুমি সব সময় পাবে। গা টিপতে পা টিপতে। হাতুড়েই ভাল।

—তা বটে। তা বটে। ঠাকুর হাসলেন—এ সব সময় আছে।

সারদা লজ্জা পেল।

খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ির মেয়েরা ধর্ম উপদেশ শুনছে। সারদাও শ্রোতা। সারাদিন খাটাখাটুনির পর বেচারী শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল। মেজ জা ঠেলে তুললে, ঠাকুর বললেন—ওকে তুল নি। এসব শুনলে এখানে থাকবে নি, চোঁচা দৌড় মারবে।

সারদা লজ্জা পেল। বার বার তিনবার লজ্জার কথা হল, আর না।

রামকৃষ্ণ শ্বশুরবাড়ির উঠোনে পুষ্পিত সজনে গাছ দেখে গান ধরলেন—যার নাকেতে নাকফুল, দু হাত মাপা চুল, তার সঙ্গে পাতাব আমি সাজনা ফুল। বড় সাধ আছে মনে—সাজনা ফুল পাতাব শাউড়ী তোর সনে।

শাশুড়ী বললেন—বাবা, আমি তোমার আর এক মা। শ্বাশুড়ী।

—তোমার পাছায় তো তা লেখা নাই।

ঠাকুরের এমন ব্যবহার কেন?

সাধক অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় সীমাবদ্ধ মানব জমিনের বাইরে চলে যান। তখন তিনি অসীম। তীক্ষ্ণতা কমলে তিনি আবার জমিনে ফিরে আসেন কিন্তু অন্যমানুষ। এঁর ব্যবহার সামাজিক মানুষের মত পরিপাটি আমড়া আটি হয় না।

মেঘবরণ যুবতীকে দেখে রামকৃষ্ণের অনুভূতি তীক্ষ্ণ হল। আহা, কী রূপ। সৌম্যা সৌম্যতরা অশেষ সৌম্যা সৌমেভ্যঃ অতি সুন্দরী, ত্বং হি পরা পরাণা পরমা, পরমেশ্বরী। ঠাকুর ভাবাবেশে যুবতীর পায়ে ফুল দিলেন।

ভাবাবেশে রামকৃষ্ণ পরিধেয় বস্ত্রও ত্যাগ করেন। হৃদয় থাকলে সামলায়, না হলে কেলেঙ্কারি।

একদিন শালী ভাত দিতে এসে দেখল উলঙ্গ ঠাকুর। দেখে ও ছুটে পালাল। জামাইবাবু যেন কী!

ঠাকুরের কথামৃত শুনবে বলে পাড়ার যত মেয়ে সারদাদের বাড়িতে জড় হয়েছে। তিনি মেয়েদের নিয়ে এমন রগড় করছেন যে যুবতীরা এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল। দু' চারজন পালাল লজ্জায়। তখন ঠাকুর হাসলেন—দেখলে গা আগড়াগুলো উড়ে গেল। এবার তোমাদের সঙ্গে কথা হবে।

রামকৃষ্ণ নারীর কথা উঠলে বললেন—পাঁকের পদ্ম। একথার ঠিক অর্থ কে জানে? ঠাকুরের কোন কোন কথা বড় রহস্যময়।

*

ছ'মাস পরে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ফিরলেন।

মথুর ও জগদম্বা দীর্ঘদিন থেকে তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করছিলেন, ঠাকুর আসতেই সকলে উঠলেন ট্রেনে।

কাশীর চৌষট্টি যোগিনী পল্লীতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল ভৈরবী যোগেশ্বরীর। কুশলসংবাদ নেওয়ার পর বললেন—কার আশ্রয়ে আছ?

—মোক্ষদার। এমন ভক্তিমতী রমণী কাশীতেও বিরল।

—কাশী এমন কেন? ভিক্ষের জন্যে বামুন পণ্ডিতরা মারামারি করে গা। মাধুকরী দেবার দিনে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড।

—সে সব ঠাঁই।

—না, না। এর চেয়ে আমার দক্ষিণেশ্বর ভাল।

—কোন তফাৎ নাই?

—আছে। এখানকার লোকের ভূষির মত বাহ্যে। এই তফাৎ।

যোগেশ্বরী হাসলেন। এই হল রসে বশে থাকা পুরুষ।

রামকৃষ্ণ প্রায় রোজই একবার ভৈরবীর কাছে যান। যখন কাশী ছাড়ার সময় হল তিনি যোগেশ্বরীকে সঙ্গে নিলেন।

কাশী থেকে বৃন্দাবন।

ঠাকুর রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দেখলেন। ব্রজধামের সব জায়গাই মনোহর কিন্তু ঠাকুরের কাছে সবচেয়ে মনোহর নিধুবন।

নিধুবনের সিদ্ধ প্রেমিকা গঙ্গামাঈ ঠাকুরকে প্রেম দিলেন। এমন প্রেম যে কামগন্ধ নাই। কী করে থাকবে? উভয়েই যে রমণী। গঙ্গা ঠাকুরকে ডাকল—দুলালী।

ঠাকুর সাড়া দিলেন। তাঁর এমন হাবভাব যেন তিনি কৃষ্ণদুলালী রাধা।

রামকৃষ্ণ বললেন—গঙ্গা, আমি আতপ চালের ভাত খেতে পারবনি।

—বেশতো সেদ্ধ চালের ভাত রাঁধব।

—আমার আবার মাঝে মাঝে পেট ছাড়ে।

—ছাড়লে আমি পরিষ্কার করব।

গঙ্গা ঠাকুরের জন্য যত্ন করে রাঁধলেন। নিরামিষ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে আজ ঠাকুরের অসুবিধা হল না। রান্না কেমন? না রাঁধুনী যেমন।

*

গঙ্গার শুধু রান্না নয়, কথাবার্তা আচার ব্যবহারও রামকৃষ্ণ ভালবাসেন। এমন ভালবাসা যে বৃন্দাবন ত্যাগের সময় তিনি নড়তে পারেন না। গঙ্গা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর বাঁ হাত ধরেছেন আর ঠাকুর বলছেন—সেজবাবু, আমি এখানেই থাকি।

—সে কী হয়? দক্ষিণেশ্বরে বুড়ী মাকে ফেলে কি করে থাকবেন? ঠাকুমা শুনলে কত দুঃখ পাবেন।

—তাহলে? রামকৃষ্ণ অসহায় চোখে হৃদয়ের দিকে তাকান। তখন হৃদয় ঠাকুরের ডান হাত ধরে টান দিল—মামা, সেজবাবু ঠিকই বলেছেন। বাড়ি ফিরে চল।

রামকৃষ্ণ চলে গেলে স্থাণুর ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন দুই অনুরাগিণী। একজন গঙ্গামাঈ আর একজন যোগেশ্বরী।

*

শিল্পী কুঁদো কাঠে নারীদেহ দেখতে পেলেন, অ-শিল্পী পেলেন না। কবি শ্রাবণের মেঘে নারীর কেশভার দেখতে পেলেন অ-কবি পেলেন না। শিল্পী ও কবি অনুভূতি বলে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করেন। সেই

বলের অভাবে অ-বাবুরা চোখ থাকতে অন্ধ। সাধক রামকৃষ্ণ নারী দেহে জগন্মাতা দেখতে পেলেন, হৃদয় পেল না। না পেয়ে ঠাকুরকে ধরল—আমাকে শেখাও।

—তোর হবে না।

—কেন?

—তুই জড়। আধ্যাত্মিক অনুভূতি নাই।

কিছুদিন পর হৃদয়ের স্ত্রী মারা গেল। মনে বৈরাগ্যের জোয়ার। আর সংসার নয়। ও শত চেষ্টা করে জড়ত্ব জয় করতে পারেনা। একাগ্রতার অভাব। মনের দুঃখে বাড়ি গেল, বিয়ে করল, সংসারী হল।

দক্ষিণেশ্বর ফিরলে ঠাকুর হাসলেন—হৃদু, তুই আমার সেবা কর। তোর ওতেই হবে। বুঝেছিস?

হৃদয় মাথা হেলিয়ে দিল। বুঝেছে।

ঠাকুর হৃদয়কে জানবাজার পাঠালেন সেজবাবুর খবর নিতে। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

মাসখানেক ভুগে মথুর মারা গেলেন।

[তিন]

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান করতে সারদামণি বাবার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর চলেছেন পায়ে হেঁটে। পথে জ্বর। শ্রীমা বলছেন—জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জা সরম রহিত হয়ে পড়ে আছি তখন দেখলাম, পাশে একজন মেয়ে এসে বসল। মেয়েটির রং কাল কিন্তু এমন সুন্দর রূপ আর কখনো দেখিনি।

শ্রীমা অপ্রত্যক্ষকে অনুভূতি বলে প্রত্যক্ষ করলেন।

যথাসময়ে সারদা দক্ষিণেশ্বর পৌঁছলেন এবং পৌঁছেই রামকৃষ্ণের

কাছে উপস্থিত। ঠাকুর বললেন—কি গো, তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?

শ্রীমা উত্তর দিলেন—না। আমি তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য কত্তে এয়েচি।

রামকৃষ্ণ দিনে সহধর্মিনীকে ধ্যানের প্রণালী শেখান। রাত্রে দু'জন এক শয্যায় দিব্যভাবে শুয়ে থাকেন। শ্রীমা বলছেন—সে যে কী অপূর্ব দিব্যভাব বল্লে বুঝাবার নয়। ভাবের ঘোরে কখন হাসি কখন কান্না কখন একেবারে স্থির হয়ে যাওয়া। এইরকম সারারাত।

ভাবের ঘোরে আড়াইশো রাত কাটল। রামকৃষ্ণ বলছেন—ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে?

সারদা সুস্থির শুয়ে থাকেন কিন্তু ঘুমোতে পারেন না। একরাতে ঠাকুর তা জানতে পারলেন। পরদিন তিনি স্ত্রীর নহবত ঘরে শোবার ব্যবস্থা করলেন।

সারদা ঠাকুরের ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন। বুকের মধ্যে কথা ঘোরে। বললেন—আমি তোমার কে?

—তুমি আমার মা আনন্দময়ী।

সাধক রামকৃষ্ণের জীবনে পত্নী, আনন্দময়ী। এ কেমন কথা? সারদা মায়ের জাত। শিশুকালে পুণ্যিপুকুর ব্রতে বলেছেঃ স্বামী সাক্ষী পুত্র কোলে যেন মরণ হয় গঙ্গার জলে। সারদার ছেলে হবে না?

রামকৃষ্ণ যেন অন্তর্যামী, সারদাকে বলছেন—ছেলের কথা ভেবোনি। তোমার এত ছেলে হবে, যে সামলাতে পারবেনি।

সারদা প্রসন্ন চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। তিনি কোন কথাই আর ভাববেন না। সব ভাবনা ঠাকুরের।

*

রামকৃষ্ণ কি এক সঙ্কল্প করেছেন। ফলহারিণী কালীপূজোর রাতে

হৃদয় সারদাকে নহবত ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এল। তারপর আর দাঁড়াল না।

রামকৃষ্ণের ডানদিকে একটা আসন; সেটায় সারদাকে বসতে তিনি ইঙ্গিত করলেন। সারদা অভিভূতের ন্যায় বসলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরালেন, মন্ত্র পড়ে গায়ে জল ছিটোলেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্কল্প পাঠ করলেন, অঙ্গন্যাস করলেন। সারদা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, যেন দেবী প্রতিমা।

রামকৃষ্ণ দেবীজ্ঞানে সারদার পূজো করলেন, ভোগ নিবেদন করলেন। সারদা দেবীর ন্যায় গ্রহণ করলেন।

রামকৃষ্ণ ও সারদা ধ্যানস্থ। দেহবোধ নাই। চিত্তের বিকার নাই। এমন অবস্থায় দুজনের প্রাণ মিলিত হল। একপ্রাণ।

রাতের তৃতীয় প্রহরে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করলেন। সারদা ধীর পায়ে ফিরে গেলেন নহবত ঘরে।

*

দেড় বছর যেন স্বপ্নঘোরে, আসলে ভাবঘোরে দুজনের কাটল। তারপর সারদা কামারপুকুর ফিরে গেলেন।

রামকৃষ্ণের কাছে রইলেন চন্দ্রমণি। তিনি এখানেই গঙ্গালাভ করবেন। তার আগেই মারা গেল রামেশ্বর। ঠাকুর মাকে দাদার মৃত্যুসংবাদ জানালে চন্দ্রমণি তা গ্রহণ করলেন শান্তমনে। সংসারের প্রতি তাঁর আর মোহ নাই।

চন্দ্রমণির বয়স হলেও শরীর মজবুত। খাটলে খুটলে কিছু হয় না। তিনি মাছের ঝোল ভাত রেঁধে ছেলেকে খেতে দিলেন।

—কেমন হয়েছে?

—অমৃত গো! এমন ফোড়ন দিয়ে তরকারী এরা করতে পারেনি।

—বৌমা এলে বলব তোমার জন্য ঝোল ভাত রেঁধে দিতে।

—বোলো। মন্দিরের ভোগ সহ্য হয় না।

—রোজ রোজ মাছের মুড়ো খেয়োনি।

ঠাকুর হাসলেন।

—আমার বড় নোলা।

*

সারদা দেড় বছর পর দক্ষিণেশ্বর ফিরলেন। চন্দ্রমণির সঙ্গে চালাঘরে থাকেন, কারণ নহবতঘরে থাকার অনেক অসুবিধা।

সারদা নানারকম ব্যঞ্জন রেঁধে মন্দিরে নিয়ে যান। কাছে বসে থেকে খাওয়ান ঠাকুরকে। কোন কোন দিন ঠাকুর আসেন চালাঘরে। খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে ফিরে যান।

আজ অঝোরে বৃষ্টি, তিনি চালাঘরে রয়ে গেলেন। শুয়ে পড়ে হাসলেন—কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ি ফেরে না।

সারদাও হাসলেন। সহজ সরল হাসি, পাঁচ নাই।

বছরখানেক পর মাকে আমাশয় ধরল। তিনি আবার বাপের বাড়ি গেলেন, কারণ ঘন ঘন ঘাটে যাওয়ার অনেক অসুবিধা। ঠাকুর হৃদয়কে বললেন—ও কেবল আসবে আর যাবে?

হৃদয় তার কী জানে? চুপ করে রইল।

সারদাদেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে হত্যা দিলেন আরোগ্য কামনায়।

এদিকে দক্ষিণেশ্বরে অশীতিপর চন্দ্রমণির অন্তিম অবস্থা। ক্ষীণ নাড়ী, অচেতন গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। রামকৃষ্ণ নতজানু হয়ে বললেন—মাগো, তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে। আমি ভুলিনি, ভুলিনি, ভুলিনি।

চন্দ্রমণির মৃত্যু হলে ঠাকুর পুত্রের কাজ করলেন না সন্ন্যাসের মর্যাদারক্ষায়। যা কিছু করণীয় ঠাকুরের ভাইপো রামলাল করল। ঠাকুর শুধু মার পায়ে তুলসী চন্দন অঞ্জলি দিলেন। আর পঞ্চবটির নিভৃতে কাঁদলেন কিছুক্ষণ।

সারদা দক্ষিণেশ্বর ত্বরায় ফিরে এলেন, উঠলেন চালাঘরে। হৃদয়ের বউও সেখানে থাকে। মন্দিরে রইল স্বামীরা, কিন্তু দুই বধূর অবস্থা এক নয়।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে হৃদয় চালাঘরে আসে। সাধারণ সুখে ওরা সুখী। সারদা একাকিনী প্রহর গোণেন। দুশ্চিন্তার মন্থর প্রহর। রামকৃষ্ণের আমাশয় হয়েছে। কাশীবাসিনী সেবা করে, সারদার পাশে থাকার উপায় নাই। তিনি নহবতঘরে ফিরে গেলেন, কাছে তো থাকা যাবে।

সারদা তেল মাখিয়ে দিলে ঠাকুর স্নান করলেন। তারপর খেতে বসলে সারদা গাঁদাল পাতার ঝোল আর পোড়ের ভাত বেড়ে দিলেন। ঠাকুর ম্লান হাসলেন—ভাগিস গাছতলাটি ছিল, নইলে কে আর এমন করে রেঁধে খাওয়াত।

সারদা বললেন—হয়েছে। কথা না বলে খেয়ে নাও।

ঠাকুর খাওয়া হতে হৃদয়কে বললেন—দেখতো তোর বাক্সে কত টাকা আছে?

হৃদয় ঠাকুরের মাসিক মাহিনা সাত টাকা তার বাক্সে তুলে রাখত, গুণে দেখল কয়েকশো টাকা। ফিরে এসে সে কথা বলল না, জিজ্ঞেস করল—তোমার আবার টাকার কি দরকার?

—আছে রে হৃদু আছে। ঠাকুর সারদার দিকে আঙুল দেখালেন—ওকে ডায়মনকাটা বালা গড়িয়ে দিতে হবে।

—ও ববাবা। তুমি এতও জান মামা।

—হুঁ। ডায়মনকাটা বালা আমি জনকনন্দিনী সীতার হাতে দেখেছি।

রামকৃষ্ণ অনেককে দেখতে পান। কালী, সীতা, লক্ষ্মী, রাধা। অন্তর্দৃষ্টি হলে দেখার কোন মানা নাই।

*

গত বছরের মত এবছরও রামকৃষ্ণ কামারপুকুর গেলেন। সঙ্গে

সারদা ও হৃদয়। কারও মন ভাল নাই। ভাইঝি লক্ষ্মীর স্বামী পালিয়েছে। কোথায় যে গেল কেউ জানে না।

রামকৃষ্ণ লক্ষ্মীকে বললেন—ধর্মকর্ম যা সব ঘরে বসে করবি।

—তীর্থ করবনি?

—একলাটি কোথাও যাবিনি। কার পাল্লায় পড়বি কে জানে। ঐ খুড়ীমার সঙ্গে থাকবি।

লক্ষ্মী সারদার পেছনে ছায়ার মত ঘোরে। শ্বশুরের সম্পত্তি যা পেয়েছিল জ্ঞাতিদের নামে লিখে দিল। সম্পত্তি নিয়ে কি হবে?

একদিন লক্ষ্মী শাড়ী খুলে রেখে গৃহদেবতা রঘুবীরের ঘরে ঢুকল। বস্ত্র অশুচি হলে কমবয়েসী মেয়েরা সাধারণতঃ তাই করে। ঠাকুর বললেন—এমন কাজ করিসনি।

—কেন গো খুড়োমশাই?

—রঘুবীরকে পাথর ভাবিসনি, তাহলেই বুঝবি।

রামকৃষ্ণের বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, লজ্জা পেল লক্ষ্মী। এই লজ্জা লক্ষ্মীর মনে রঘুবীর-চেতনা জাগ্রত করে। মানো তো রামচন্দর নয় তো কালা পত্থর।

বৈঠকখানায় কীর্তনের আসর বসেছে। কীর্তনীয়া রমণী বড়ই চতুরা। সে গায়—আমার এ প্রেম রাখব কোথা? আর গাইতে গাইতে রামকৃষ্ণের গায়ে এসে পড়ে।

ঠাকুর আসর ছেড়ে পুকুরপাড়ে আস্তাকুঁড়ের ধারে গেলেন। ফিরে এলেন একটা ভাঙা ধুনুচি হাতে। মুখে রঙ্গরসের ছায়া।

বললেন—এই ধুনুচিতে তোমার প্রেম রাখ।

—রাধে!

—রাধাকে ডাকছ কেন? যেমন প্রেম তেমন তো আধার হবে।

রমণী লজ্জা পেল। এই লজ্জা রমণার মনে কৃষ্ণচেতনা সৃষ্টি করে। কৃষ্ণসুখ প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

চিদানন্দ ঠাকুরের কাজ ঈশ্বর-চেতনা জাগ্রত করা জীবের হৃদয়ে। চেত, চেত রে চেত, ডাকে চিদানন্দ: চেতনা রয়েছে যার সেই চিদানন্দ।

পুকুরপাড়ে মেয়েরা জড় হয়েছে। বাসন মাজতে, ক্ষার কাচতে হাত চলছে আর তুচ্ছ কথায় রঙ্গরসে চলছে মুখ।

এক প্রবীণা আর এক প্রবীণাকে বলছেন—নেজাটার ঝাল করনু, মুড়োটা ডালে দিনু, চাকাটার ঝোল করনু।

—তা দিদি, ক'চাকা হইছিল ?

- চার চাকা।

—তাহলে তো বড় পোনা।

—সেরটাক হবে। হালদার পুকুরের মাছ বেশ পুরুষ্ট।

রামকৃষ্ণ বৈঠকখানা থেকে নেমে এলেন।

—কি এত মাছের গপ্পো করছ গা ? বয়েস হয়েছে, ভগবানের নাম কর নইলে তীর্থের গল্প কর।

—ঠাকুর আমরা কি সে ভাগ্যি করেছি !

—তা মাছের গপ্পো করলে কী ভাগ্যি ফিরবে ?

প্রবীণা উত্তর করতে পারে না। না পেরে বলল—আমাদের পাঁচ ঝামেলা। বেয়াই এয়েচে, হেঁসেল ঠেলতে জীবন গেল। মলে বাঁচি।

—মলে যে বাঁচবে তার কাজ করতেই তো বলছি। যদি আমার কথা না শোনো পরলোকে কষ্ট পাবে। সেখানে তো বেয়াইবাড়ি নাই যে, গিয়ে পিঁড়িতে পোঁদ দিয়ে বসবে আর বেয়ান নুচি ভেজে ভেজে দেবে।

প্রবীণা লজ্জা পেলেন। এই লজ্জা প্রবীণার মনে পরকাল-চেতনা জাগ্রত করে। দিন গেল দালে ঝোলে, রাত্রি গেল নাকের বোলে।

মনুষ্যোচিত কাজ কিছুই হল না। রামকৃষ্ণ বলছেন—মনে, বনে, কোনে। নিভৃত স্থানে সংসার থেকে সরে মনকে একাগ্র কর। তাহলে ভাব আসবে, আধ্যাত্মিক অনুভূতি হবে। তবেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা।

•

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ফিরবেন। সকলের কাছে বিদায় নিচ্ছেন, প্রসন্নময়ী বললেন—আবার এসিস, গদাই।

—আসব। লক্ষ্মীকে দেখ, ওকে দেখ।

রামকৃষ্ণ সারদাকে কামারপুকুর রেখে গেলেন। অভিমানে সারদা বিছানায় শুয়ে রইলেন, দেখা করলেন না।

কিছুদিন পর পূর্ণানন্দ সন্ন্যাসী কামারপুকুর এলেন। সারদা ও লক্ষ্মী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছে। দীক্ষা নেওয়ার পর দুজন দক্ষিণেশ্বর গেলেন।

ঠাকুর সারদাকে বললেন—যেসব মেয়েরা কালীবাড়ি আসে তাদের পরামর্শ শুনো নি।

—কিসের পরামর্শ?

—এই আমার মন ফেরাবার পরামর্শ। ওষুধ পালা করতে বলে। তুমি যেন সে সব কোরোনি।

সারদা মাথা নাড়লেন। তুকতাক করবেন না।

ঠাকুর আবার বললেন—ঈশ্বরকে জেনে সংসার করলে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দু'জনই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয় ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে।

সারদা মুখ তুলে তাকালেন—তাই করব।

রামকৃষ্ণ স্বস্তি বোধ করলেন। যে স্ত্রী অবিদ্যা নয় সে ধর্মের সহায়, বন্ধু।

[চার]

আঠারশো উনআশি সাল। দলে দলে ভক্ত আসছেন ঠাকুরের কথামৃত পান করতে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন : স্ত্রী পুত্র নিয়ে থাকবে : যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু। কামিনী ঈশ্বরবিমুখ করে। কাঞ্চনে ঈশ্বর লাভ হয় না। তাই কামিনী কাঞ্চন জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ ?

মাষ্টার মাথা হেলিয়ে দিলেন। বুঝেছেন।

পরমহংস আবার বললেন—বিচার কর, সুন্দরীর দেহে কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র এইসব। এমন কিছু কী ? এইবার ঈশ্বর চিন্তায় মন দাও।

শিবনাথ আদি ভক্তগণ এসেছেন দক্ষিণেশ্বর।

পরমহংস বলছেন—সংসারীকে যদি ঈশ্বরচিন্তায় মন দিতে বল তা তারা শুনবে না। তাই বিষয়ীদের টানবার জন্য গৌর নিতাই ব্যবস্থা করেছিলেন—মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল। প্রথম দুটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেত। পরে বুঝত, মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয়। হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই। আর যুবতী মেয়ের কোল হল, ধুলায় গড়াগড়ি যাওয়া।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করতে এসেছেন। সঙ্গে তিন চারটি ব্রাহ্মভক্ত। মন্ত্রমুগ্ধ সাপ যেমন ফণা মেলে সাপুড়ের কাছে বসে থাকে বিজয়ও তেমনি রামকৃষ্ণের কাছে বসে আছেন। মন্ত্রমুগ্ধ।

রামকৃষ্ণ মন্ত্র পড়ার ন্যায় বলছেন—বদ্ধজীব বুঝেও বোঝে না। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি অতি প্রবল, সহজে যায় না। এত দুঃখ এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

বিজয় জিজ্ঞেস করলেন—বদ্ধজীবের কী অবস্থা হলে মুক্তি হতে পারে?

—ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের চোখে চোখ রাখলেন—আগে অত আসতে, এখন আস না কেন?

—ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্বীকার করেছি। স্বাধীন নই।

—কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চলে যায়।

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন—মহাশয়, মেয়েমানুষকে কী ঘৃণা করব?

—ঘৃণা নয়, ভয় করবে। তবে যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তিনি ভয় করবেন না। তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ।

বিজয় প্রশ্ন করলেন—মহাশয়, কী করে ঈশ্বর লাভ হয়?

—সপ্তভূমিতে মন গেলে। মন সচরাচর লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি এই তিন ভূমিতে। তখন মনের আসক্তি কেবল কামিনী কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতি দর্শন হয়।

রবিবারে অনেকই অবসর পান, তাই ভক্ত সমাগম বাড়ে। অধর, রাখাল মাস্টার আর পণ্ডিত পদ্মলোচন এসেছেন।

পদ্মলোচন প্রশ্ন করলেন—আপনি পরমহংস বালকস্বভাব। আপনি কেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন? এটা টাকা এটা মাটি এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।

রামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ওসব ভাল লাগে না।

পরমহংস নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল। ধর্মপত্নী সারদাকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলেন, ঈশ্বরের গান করেন, ঈশ্বরের ধ্যান করেন। মায়িক কোন সম্বন্ধ নাই।

সাধকের জীবনে নারীর এমন স্থান বিরল ঘটনা।

*

রামকৃষ্ণ জয়গোপাল সেনের বাড়ি এসেছেন। ভক্তরা তাঁর এবং শ্রীরাম সম্বন্ধে কত কী ভাবছেন। এক ভক্ত সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন—মহাশয়, আপনি স্বামীস্ত্রীর যেরূপ সম্বন্ধের আদর্শ রেখেছেন, তা কী আমাদের পক্ষে সম্ভব?

—অসম্ভব নয়। এরূপটি হতে গেলে দুজনের ভাব হওয়া চাই। দুজনই যদি ঈশ্বরানন্দ পেতে চায় তাহলে এটি সম্ভব। নাহলে সর্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়।

—তফাতে যাওয়া মানেই তো সংসার ত্যাগ?

—ত্যাগ কেন হবে? বাড়ির কাছে এমন একটি আড্ডা করতে হয়, যেখান থেকে বাড়িতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেনকে বলেছিলুম নির্জনে না গেলে রোগ সারবে কেমন করে? যে ঘরে রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। আচার তেঁতুল—এই দেখো বলতে বলতে আমার মুখে জল এসেছে।

ভক্তেরা হাসলেন।

পরমহংস বলছেন—মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। ভোগবাসনা—জলের জালা। দিনকতক ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই জলের জালা নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে থাকলে কামিনীকাঞ্চন কিছু করতে পারে না।

ত্রৈলোক্য প্রশ্ন করলেন—ঈশ্বরলাভ হয়েছে তার লক্ষণ কী?

—যখন ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হবে তখন। তখন কামিনীকাঞ্চনে আসক্তিও চলে যাবে।

এক কামিনী প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর, কী করলে আমাদের ঈশ্বরে মতি হয়?

পরমহংস স্ত্রীভক্তকে বললেন—তোমাদের ঈশ্বরে মতি হওয়া কী সহজ গা? যার তিনকুলে কেউ নেই, মহামায়া তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে। সে বিড়ালের মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে, আর বলবে, মাছ দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কী করি?

—হাঁ বাবা। আমরা ঝাড়া হাত পা হলেও জড়িয়ে পড়ি। লতার স্বভাব।

—তাই। কারুর বিয়ের পর স্বামী মরে গেল। কড়ে রাঁড়ি ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়, ভাইয়ের ঘরে গিন্নী হল। মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলে বেঁধে হাত নেড়ে গিন্নীপনা কচ্চেন। আর বলে বেড়াচ্চেন, আমি নাহলে দাদার খাওয়াই হয় না। মর মাগি, তোর কী হল তা হ্যাখ; তা না—

কামিনী চমকে উঠলেন।

প্রতাপ থিইষ্টিক কোয়ার্টালি পত্রিকায় লিখলেন: পমহংসদেবের অন্তরের পবিত্রতা ও স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব অতি অদ্ভুত ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। কেবলমাত্র কাম কাঞ্চন ত্যাগেই তাঁহার অতুলনীয় নৈতিক চরিত্রের মূল রহস্য।

*

রামকৃষ্ণ কামারপুকুর এসে ম্যালেরিয়ায় পড়লেন। জ্বরে জ্বরে শরীর জীর্ণ, মন খারাপ। তিনি হৃদয়কে বললেন—আর এখানে আসব নি। সাংসারিক কাজ কর্ম সেরে ফেলি।

রামকৃষ্ণ গৃহদেবতা রঘুবীরের বিধিমত সেবার জন্য দেবোত্তর জমি কিনলেন, রামলালের বিধবা মাসীকে বাড়িতে এনে রাখলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বর ফিরলেন।

হৃদয়রামের মনের ইচ্ছা, যশস্বী মামাকে ভাঙ্গিয়ে দুপয়সা কামাবে। মামা প্রশ্রয় দিলেন না। ফলে হৃদয় বিরুদ্ধাচরণ সুরু করল। পরমহংসদেব কেঁদে ফেললেন—মা, তুই আমার সংসার বন্ধন কাটিয়ে দিলি, বাপ মা ভাই স্ত্রী সব গেল, শেষে কিনা হৃদয়ের হাতে এই দুর্গতি।

কিছুদিন পর হৃদয়রামের চাকরী গেল। কালীবাড়ীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। পরমহংসদেব মাষ্টারকে বললেন—হৃদে সেবাও যেমন করেচে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েচে। ও বলে কি না, আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেত।

মাষ্টার শ্রীমার দিকে তাকালেন। তাতেই মনের কথা বলা হয়ে গেল।

*

সারদা দিন গোণেন। কবে তাঁর সন্তানসৌভাগ্য হবে? ঠাকুর বলেছেন, এত ছেলে হবে যে সামলাতে পারবে নি। সাধুবাক্য মিথ্যা হবার নয়। কবে ছেলের মুখ দেখবেন?

আঠারশো আশি সাল। রামকৃষ্ণ নহবতঘরে সারদাকে বলে পাঠালেন—ছেলে এয়েচে বউ নিয়ে। টাকা দিয়ে বউয়ের মুখ দেখ।

সারদা রাখাল আর বিশ্বেশ্বরীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। যেন প্রবাস থেকে ছেলে-বউ ফিরেছে। মাতৃহৃদয় জুড়িয়ে যায়।

আঠারো বছরের রাখাল বউ নিয়ে থাকে। কিছুকাল পর বিশ্বেশ্বরীর গর্ভে সন্তান এল। পরমহংসদেব ও শ্রীমা পরামর্শ করে পুত্রবধূকে কোন্নগর পাঠালেন। সেখানে প্রসব হবে।

বিশ্বেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর ফিরলে পরমহংসদেব ও শ্রীমা নাতিকে কোলে নিলেন, চুমু খেলেন, হাতে টাকা দিলেন। যেমন সব সংসারী করে, অবিকল তেমনি, কিন্তু তিনি মায়াবদ্ধ সংসারী নন।

শুভদিনে পরমহংসদেব রাখালকে দীক্ষা দিলেন। রাখাল হল স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

আবার এক ছেলে এল, পরের বছর।

শিমলায় সুরেন মিত্রের বাড়িতে আনন্দোৎসব। রামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত। তাঁকে ভজন গেয়ে শোনাচ্ছে এক সুন্দরকান্তি তরুণ। ঠাকুর ভক্তদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন তরুণের নাম নরেন, কলেজে পড়ে।

নরেন একদিন দক্ষিণেশ্বর এলেন। রামকৃষ্ণের কথামত গাইলেন—মন চল নিজ নিকেতনে। কিছুদিন পর আবার এলেন। সেদিন পরমহংসদেব ডান পা দিয়ে নরেনকে স্পর্শ করলেন আর তিনি দর্শন করলেন বিশ্বরূপ। জাগতিক বস্তুসমূহ বেগের আবেগে অস্থির। এই আছে এই নাই। তিনি নিজেও তথৈবচ। এই আছেন এই নাই।

নরেন বার বার আসেন দক্ষিণেশ্বর। পরমহংসদেব ও শ্রীমার কাছে বসেন। তাঁদের কী অপত্যস্নেহ, নরেনের জন্য পাগল।

পরমহংসদেব বলছেন—নরেন ও অন্যান্য ছেলেরা, রাখাল, ভবনাথ পূর্ণ, বাবুরাম, যোগীন, নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে। এ ভালবাসা তো মানুষ জ্ঞানে নয়, ঈশ্বর জ্ঞানে।

শ্রীম লিখছেন—ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা। তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন।

যোগীনের বয়েস ষোল। বিয়ে করেছেন কিন্তু বউয়ের কাছ থেকে সরে সরে থাকেন। মনে হয়েছে, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না।

যোগীন দক্ষিনেশ্বর এসেছেন পরমহংসদেবকে দর্শন করতে। দেখলেন, রামকৃষ্ণ পরণের কাপড়খানি বগলে করে দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়।

যোগীন থমকে দাঁড়ালে রামকৃষ্ণ এগিয়ে এলেন—বিয়ে করেছিস, তাতে ভয় কী? তাঁর কৃপা থাকলে ষোলটা বিয়ে করলেও কোন ক্ষতি হবে না।

যোগীন রামকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তারপর

প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর আসেন আর ঠাকুরের কাছেই রাত কাটান। বাড়ি ফিরতে মন চায় না।

দুপুর রাতে যোগীনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখলেন ঠাকুর বিছানায় নাই। বেরিয়ে এসেও দেখতে পেলেন না। তাঁর চোখের মণি নড়ল। রামকৃষ্ণ কী সারদার কাছে গেলেন? যোগীন নহবত ঘরের দিকে গেলেন পা টিপে টিপে। দেখলেন, শ্রীমা দুয়োরে বসে মালা জপছেন। একাকিনী এবং ধ্যানস্থা। আরও দেখলেন পরমহংসদেব পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছেন।

রামকৃষ্ণ বললেন—কীরে! তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে।

যোগীন বাক্যহারা। রামকৃষ্ণ বললেন—বেশ বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।

সারদা মায়ের সংসার ছেলেয় ছেলেয় ভরে গেল। কী সব ছেলে। বাবুরামের কথা হতে পরমহংসদেব বললেন—ও হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। আর শরতের কথা হতে শ্রীমা বললেন—যোগীন আর শরৎ এ দুজন আমার অন্তরঙ্গ। নিরঞ্জনের বড় দয়া, টাকা খরচ করে গরীব দুঃখীদের চিকিৎসা করায়। লাটুকে দিয়ে শ্রীমা জল আনান, বাজার করান। লাটু সারাদিন খাটে আর সারারাত ধ্যান করে। শশী চাদরের খুঁটে বরফ বেঁধে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে। রোদে মুখ ঝলসে গেছে, খেয়াল নাই। ঠাকুর বরফ থেকে ভালবাসেন, তাঁর জন্য বরফ নিয়ে যাচ্ছে। এতেই সুখী।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যেমন স্ত্রী তেমন সব ছেলেমেয়ে। এর তুলনা নাই।

*

মণি মল্লিকের মেয়ে নন্দিনী বলল—বাবা, ধ্যান করতে বসলে এর ওর মুখ মনে পড়ে। ধ্যান হয় না।

—কার মুখ মনে পড়ে?

—ভাইপোর।

—বেশ তো। তার জন্যে যা কিছু করবে গোপাল ভেবে কোরো। তুমি যেন গোপালকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ, সেবা করচ, এইরকম ভাব নিয়ে কোরো। মানুষের করচি ভেবো নি।

নন্দিনী তাই করে।

মণি মল্লিক মহাধনী। কাশীতে কুঠি আছে। ব্যবসার কাজে কাশী যান সাধুসঙ্গও করেন। এবার কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী ও ভাস্করানন্দের দর্শন হয়েছে। মণি মল্লিক রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বসলেন।

রামকৃষ্ণ বললেন—দেখ রাখাল বলছিল ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুকুর কাটাও না কেন। তোমার তো অনেক টাকা আছে। তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসেবী।

মণি চুপ করে রইলেন। পরে কথার পিঠে বললেন—মহাশয়, পুষ্করিণীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলি-ফেলি বলা কেন?

ভক্তরা হাসলেন। রামকৃষ্ণও। হেসে বললেন—নন্দিনী কেমন আছে?

—ভাল। আপনার কৃপায় ভাব এসেছে।

সন্ধ্যা। পরমহংসদেব ভাবের ঘোরে রয়েছেন। দাসী ঘরে ধুনা দিয়ে গেল। ভক্তগণ নির্বাক।

ভগবতী দূর থেকে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করল। তিনি ওকে অনেকদিন থেকে জানেন, বসতে বললেন। ভগবতী বসল।

রামকৃষ্ণ বললেন—টাকা যা রোজগার করলি, সাধুবৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?

—তা আর কী বলব?

— কাশী, বৃন্দাবন, এসব হয়েচে ?

—কাশীতে একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি।

— বেশ, বেশ।

ভগবতী খুশী হয়ে রামকৃষ্ণের পায়ে হাত দিল। অমনি তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পা জ্বলে যায়। তিনি জালা থেকে গঙ্গাজল নিয়ে পা ধুলেন।

ভগবতী মরমে মরে যায়।

রামকৃষ্ণ কন্যাস্নেহে ভগবতীকে বললেন – তোরা অমনি প্রণাম করবি।

ভগবতী লজ্জায় মুখ তুলতে পারে না। তখন ঠাকুর যেভাবে ছোট মেয়েকে ভোলায়, সেভাবে বললেন —একটু গান শোন। মন ভাল হবে।

রামকৃষ্ণের আর এক মেয়ে অঘোরমণি। তিনি বালবিধবা, জন্মদুঃখিনী।

অঘোরমণি দুপয়সার দেদো নিয়ে পরমহংসদেবকে দর্শন করতে এসেছেন। ঠাকুর আনন্দের আতিশয্যে চাৎকার করলেন—আমার জন্যে কী এনেচ ?

অঘোরমণি লজ্জায় দেদোসন্দেশ বের করতে পারেন না। অত্যন্ত সঙ্কোচ করে শেষমেষ হাত উপুড় করলেন। রামকৃষ্ণ খেতে খেতে বললেন—তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন ? নারকেল নাড়ু করে ঘরে রাখবে। তাই নিয়ে আসবে দুটো।

—আচ্ছা, গোপাল, নাড়ুই নিয়ে আসব।

—না হয় লাউশাক চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার তরকারি নিয়ে আসবে।

দিনকয়েক পর অঘোরমণি তিনমাইল হেঁটে গোপালের জন্য চচ্চড়ি নিয়ে হাজির। রামকৃষ্ণ মেয়ের হাতের চচ্চড়ি খাচ্ছেন আর বলছেন— আহা কী রান্না, যেন সুধা।

নন্দিনী, অঘোরমণির মত কত মেয়ে রামকৃষ্ণের। শ্যামাসুন্দরী, যোগীন্দ্রমোহিনী, অন্নপূর্ণা, গৌরদাসী, কৃষ্ণভাবিনী, নিকুঞ্জদেবী এবং আরও কত জন। ঘরে ভাল খাবার হলে এইসব মেয়েরা বাবার জন্য নিয়ে যান, নাহলে কাউকে দিয়ে পাঠান। ঠাকুরকে না দিয়ে কখনই নিজেরা খান না। আর কতবার যে ঠাকুরকে দেখতে যান, দেখে আশা মেটে না।

[পাঁচ]

আঠারোশো পঁচাশি সাল। রামকৃষ্ণ কলকাতায় বলরামের বাড়িতে রয়েছেন। সঙ্গে পুত্রকন্যাসম ভক্তগণ।

পরমহংসদেব মাষ্টারকে বললেন—আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়, কিসে ভাল হয় বাপূ? ঠাণ্ডা একটু দেবে?

—আজ্ঞা, ডাব-টাব?

—মিচরির সরবৎ দাও।

সরবৎ খাওয়ার পর ঠাকুর এলোমেলো বসে আছেন। ভক্তেরা হাসছে। ঠাকুর বললেন—যেন মাই দিতে বসেছি।

হাসির রোল ওঠে।

পরমহংসদেবের গলায় ক্যানসার। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে। এখানে চিকিৎসা ঠিকমত চলছে না। ঠাকুরের কষ্ট দেখে শ্রীমা ও ভক্তেরা উদ্বিগ্ন। ঠাকুর নিশ্চিন্তার গলায় বললেন—ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শরৎ বউবাজারের ডাক্তার রাখালদাস ঘোষকে ডেকে আনল। তাঁর চিকিৎসায় রোগের উপশম হল না। তখন গোলাপ-মা ঠাকুরকে প্রথমে নৌকায় পরে ঘোড়ারগাড়ীতে ডাক্তার দুর্গাচরণ মিত্রের কাছে নিয়ে গেলেন। এবার কিছু উপকার হল।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিনে পানিহাটিতে মহোৎসব। ঠাকুরের পুত্রকন্যারা দক্ষিণেশ্বর উপস্থিত। মা বাবাকে উৎসব দেখাতে নিয়ে যাবে। একটি নৌকায় ঠাকুর ও ছেলেরা অপরটিতে ঠাকুরাণী ও মেয়েরা।

নৌকা থেকে নেমে সকলে মনি সেনের বাড়ি উঠলেন। ঠাকুর-বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল, শুনতে বসলেন ঠাকুর। কিছুক্ষণ শোনার পর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বললেন—ঢং দেখ।

বলে তিনি নাটমন্দিরে ছুটে গেলেন। ভাবাবেশে এমন নৃত্য করেন যে সমবেত নরনারী মুগ্ধ। তারাও নৃত্য করে।

সদলে রামকৃষ্ণ রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি এলেন। মন্দিরে আধঘণ্টা কাটল। কন্যারা ফল মিষ্টি খাওয়ালেন।

বৃষ্টি নামল, ঠাকুর ভিজলেন এবং ভিজে গায়েই ফিরলেন দক্ষিণেশ্বর।

সকালে ঠাকুর তক্তপোষে চুপ করে বসে আছেন। রাখাল বলল—বাবা, কী হয়েচে?

—গলায় ব্যথা। ডাক্তার বেশী কথা কইতে মানা করেচে।

—কাল রাত্তিরে অত ভিজলেন।

—দেখ্ দিকি। উপরে জল নীচে জল। আর রাম কিনা আমাকে পেনেটিতে সারারাত নাচিয়ে নিয়ে এল।

—রামের ভারি অন্যায়।···চুপ করে শুয়ে থাকুন।

—একবারে কথা না বলে কী থাকা যায়? তুই কতদূর থেকে এলি, তোর সঙ্গে কথা বলব না?

—নাই বা কইলেন। ভালো হন, কথা শুনব।

ঠাকুর গলার ব্যথা উপেক্ষা করে কত কথা বললেন।

রামকৃষ্ণ সস্নেহে নরেন্দ্রকে দেখছেন। সহসা বললেন—বাবা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না।

বলে গান ধরলেন—কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই। মনে সন্ধ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই।

রামকৃষ্ণের বড় ভয়, নরেন বুঝি নিজের হল না।

মিথ্যে ভয় ঠাকুরের। নরেন্দ্রর চোখে জল। বললেন—বেশী কথা বলবেন না। আপনার কঠিন অসুখ।

—তুই কী ডাক্তার? শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

নরেন্দ্র ম্লান হাসলেন। মন ভাল নাই; ক্যানসার দুরারোগ্য ব্যাধি। ঠাকুর কী আর সেরে উঠবেন?

বৈশাখী শুক্লা দশমী। চাঁদের আলোয় মন্দির ঝলমল করছে। রামকৃষ্ণ নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল। খাচ্ছেন আর নরেন্দ্রর খবর নিচ্ছেন।

নরেন্দ্র অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসেছেন। ঠাকুর হঠাৎ নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা নিয়ে নরেন্দ্রের কাছে হাজির। বললেন—নরেন, তুই এইটুকু খা।

এমন পিতাপুত্র লাখেও একটা হয় না।

*

রাম, নরেন্দ্র, রাখাল, দেবেন্দ্র এঁরা পরামর্শ করে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন। শাঁখারিটোলায় ডাক্তার সরকারের বাড়ি, খুব নামডাক। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি দুরকম শাস্ত্রে জ্ঞান। তিনি ঠাকুরের চিকিৎসা করছেন। আর করছেন ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র।

তাঁরা ক্ষত পরীক্ষা করে বললেন—ক্লার্জিম্যানস্‌ থ্রোট ডিজিজ। বেশী বকবেন না।

না বকে উপায় আছে? দিনরাত সন্তানেরা আসছে। তিনি মাকে বললেন—রাতদিন এটাকে বাজালে আর কদিন টিকবে?

সারদা ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান না, সব সময় ছেলে-মেয়েরা রয়েছে। আজ রামকৃষ্ণ স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

বললেন—নরেন্দ্র আসবে। আমার জন্যে যে ঝোল ভাত রাঁধ, তার থেকে ওকে খেতে দিও।

—আচ্ছা।···কেমন আছ?

—যেমন মা রেখেছে।

সারদার মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। রামকৃষ্ণের দৃষ্টি এড়াল না। বললেন—যখন কলকাতায় রাত কাটাব, যার তার হাতে খাব, তখন জানবে আর বিলম্ব নাই।

সারদা প্রাণপণে চোখের জল আটকাবার চেষ্টা করছেন, দু'এক ফোঁটা পবিত্র অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ঠাকুর বললেন—কেঁদোনি। এঘর ওঘর বইতো নয়।

তবু না সারদা কাঁদেন।

রামকৃষ্ণের গলার ব্যথা বেড়েছে। দুধভাত ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে নামে না। সারদা গাইদুধের খোঁজে রাখালকে পাঠালে এক বেহারী রমণী দুধ নিয়ে এল। তারপর বসে রইল ঠাকুরের ঘরের পাশে। রমণীর মন কেমন করে বাবার জন্য।

খাওয়ার পর রামকৃষ্ণ গোপিণীকে বললেন—গলায় বড় বেদনা গো, তুমি মন্ত্র পড়ে গলায় হাত বুলিয়ে দাও।

গোপিণী অবাক। ঠাকুর কেমন করে তার মন্ত্রজ্ঞানের কথা জানাল? একথা সারদাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন—ঠাকুর অন্তর্যামী।

*

রামকৃষ্ণ কলকাতায় থেকে চিকিৎসা করাতে রাজী। বাগবাজারে ছোট একটি বাসায় এনে তাঁকে তোলা হল। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পরীক্ষা করে বললেন—রোহিনী

অর্থাৎ ক্যানসার। এ ব্যাধির চিকিৎসা একমাত্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার করতে পারেন।

ডাক্তার সরকার আগে ঠাকুরের চিকিৎসা করেছেন, আবার শুরু করলেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্যে ঠাকুরকে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে বড় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুদিন চিকিৎসার পর গলা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হল। ঠাকুর যেন অনেকটা সুস্থ।

ছেলেরা বলল, মা না এলে হবে না। কে যত্ন করে পথ্য তৈরী করবে? কে দিনরাত বাবার সেবা করবে? এ কী আমাদের কাজ?

মা সারদা চলে এলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। ঠাকুরের বড় ঘরের পশ্চিমে দুখানি ছোট ঘর, একটিতে ছেলেরা থাকে অপরটিতে মা থাকেন।

শ্রীমা রাত তিনটেয় উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সারেন। তারপর সারা-দিন ছাতের সঙ্কীর্ণ চাতালে বসে পথ্য তৈরী করেন। মাঝে মাঝে নেমে আসেন ঠাকুরকে খাওয়াতে। রাত এগারোটায় মা-র ছুটি ঘণ্টা তিনেক ঘুমোন।

ছেলেরা, শরৎ, শশী, নরেন, খেতে বাড়ি যায় এই পর্যন্ত। বাকী সময় ডাক্তার, ওষুধের দোকান, ফলের দোকান ছোটাছুটি করে। শেষ-মেষ বাড়ি যাওয়াও বন্ধ হল। সর্বক্ষণ ঠাকুরের সেবা।

পূর্ণ আর মণীন্দ্র স্কুলের ছেলে। পনেরো ষোল বছর বয়েস। ঠাকুর ওদের দেখার জন্য ব্যাকুল। মাষ্টারকে বললেন—আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল। বেশ স্বভাব।

—আজ্ঞা হাঁ।

—মণীন্দ্রের প্রকৃতি ভাব। বড় ভাল ছেলে।

—আজ্ঞা হাঁ।

—মনে আছে পূর্ণকে দেখবার জন্যে রাত্রিবেলা দক্ষিণেশ্বর থেকে তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম।

মাস্টার মাথা হেলিয়ে দিল। মনে আছে।

*

ঠাকুর এত অসুস্থ, তবুও তাঁর প্রফুল্ল মন। ডাক্তার সরকার দেখতে এসে বললেন—আবার কাশী হয়েছে। তা কাশীতে যাওয়া ভাল।

—তাতে ত মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই।

ডাক্তার হাসলেন॥

সকলে পারিবারিক কথা বলছেন, হঠাৎ রামকৃষ্ণ ডাক্তার সরকারকে বললেন—কী মাগ মাগ করছ? ওসব ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরে মন দাও। আনন্দ পাবে।

ডাক্তার রাগ করলেন না।

আজ কালীপুজো। কিছু আয়োজন করা হয়েছে।

বেলা দুটোর সময় ডাক্তার এলেন। দেখা হলে বললেন, গান শুনব। মাস্টার গান গেয়ে শোনালেন। তারপর গিরীশ।

গান শুনতে শুনতে মণীন্দ্রের ভাব এসে গেল। ডাক্তার অবাক চোখে মণীন্দ্রকে দেখছেন, ঠাকুর বললেন—তোমার ছেলেটিকে একদিন এনো।

ডাক্তার মাথা হেলিয়ে দিল। আনবো।

কথায় কথায় কে যেন বলল, কাল প্রতাপ ডাক্তার ঠাকুরকে নকস্‌ভমিকা দিয়েছিল। শুনে ডাক্তার চটে গেলেন—আমি তো মরি নাই।

—তোমার অবিদ্যা মরুক।

—আমার কোন কালে অবিদ্যা নাই।

—না লো। ঠাকুর হাসলেন—সন্ন্যাসীর অবিদ্যা যা মরে যায় আর বিবেক সন্তান হয়।

ডাক্তারের চোখের মণি স্থির। বড় তাৎপর্য পূর্ণ কথা।

রাত্রি সাতটা। পুজোর সমস্ত আয়োজন হয়েছে। ঠাকুরকে ঘিরে নরেন, শরৎ, রাখাল আরও অনেক সন্তান।

ঠাকুর বললেন—একটু সবাই ধ্যান কর।

ধ্যানের পর সকলে ঠাকুরের চরণে ফুল দিয়ে প্রণাম করল, স্তব গাইল। ঠাকুর ভাবে বিভোর।

অনেকক্ষণ পর বললেন—সুরেনের বাড়িতে কালীপুজো হবে, তোমরা নিমন্ত্রণে যাও।

ছেলেদের প্রসাদ পেয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দুটো। ফিরে ওরা দেখে মা সারদা তাদের অপেক্ষায় বসে আছেন।

ডাক্তার সরকার ছেলেকে সঙ্গে এনেছেন। কিশোর। ঠাকুর দেখতে পেয়েই উঠে এলেন, হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর কানের কাছে মুখ এনে গোপন কথা বলার মত বললেন—বাবা, আমি তোমার জন্যে এখানে এয়েচি।

কিশোর আনন্দে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরল।

ফিরে এলে ডাক্তার হাসলেন—দুজনে কী এত গোপন কথা হল?

—সে তুমি বুঝবে নি।

বলে ঠাকুর কিশোরের চোখে চোখ রাখল। দুজনই সরল হাসছে। একজন বালক অপরজন বালক স্বভাব।

আজ এক হ্যাটকোট পরা সায়েব এসেছে পরমহংসদেবকে দেখতে। ঘরে কেউ নাই, ঠাকুর একা।

রামকৃষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলেন।

—তোমার ক্ষমতা আছে বাপু। এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দেয়া কী সহজ কথা। তুমি বলেই পেরেছ।—

—এ ছাড়া আপনাকে দর্শন করার উপায় ছিল না।

—তোমাকে আমার মনে আছে। দক্ষযজ্ঞে কী অভিনয় করলে! ঠিক যেন সতী।

অভিনেত্রী বিনোদিনী হাপুস নয়নে কাঁদে—ঠাকুর, যেদিন শুনলাম আপনার অসুখ, সেদিনই গিরীশবাবুকে ধরলাম। তিনি আজ কাল করেন তখন কালীপদর শরণ নিলাম।

বিনোদিনী কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখল। ঠাকুর ওর বুকে হাত দিয়ে বললেন—মা, তোমার চৈতন্য হোক।

*

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে নিজের ঘরে বসে রয়েছেন। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের দিকে তাকাচ্ছেন।

নরেন বললেন—ওখানে যাব মনে করছি।

—কোথায়?

দক্ষিণেশ্বরে, বেলতলায়। ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাব।

—না! পঞ্চবটি বেশ জায়গা।

বলে ঠাকুর কালীপদ'র আনা আঙ্গুর নরেন্দ্রকে দিলেন।

রাত প্রায় নটা। ঠাকুর থেকে থেকে নরেন্দ্রের কথা বলছেন।

—নরেন্দ্রের প্রাণ কেমন আটপাটু হয়েছে দেখেছিস। দর্শনের আর দেরী নাই।

সেই রাতেই নরেন দক্ষিণেশ্বর চলে গেল।

পরদিন সকালে নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে এলেন।

—বাড়ি যাই এবার। একজন বন্ধু বলেছে একশো টাকা ধার দেবে। পেলে তিনমাসের মত নিশ্চিন্তি।

ঠাকুর এক দৃষ্টে নরেন্দ্রকে দেখছেন। কথা বলছেন না।

আঠারো শো ছিয়াশি সাল

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে বারোজন ছেলে—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, কালী, শশী, শরৎ, আর দুই গোপাল। এক গোপালের বয়েস হয়েছে। সে যাক, সকলে পালা করে কাজ করে। নিত্য ডাক্তারদের কাছে যায়, ওষুধপত্তর আনে, দেখেশুনে মাংস কেনে। ডাক্তার কচি পাঠার সুরুয়া খাওয়াতে বলেছেন।

সারদা ডাক্তারের পরামর্শমত পথ্য রাঁধেন, লক্ষ্মী তাঁর সহায়। সহায় নন্দিনী, নিকুঞ্জদেবী ও অন্যান্য মেয়েরাও। কেউ দুদিন কেউ চারদিন ঠাকুরের সেবা করে।

চোদ্দই মাচ। ঠাকুর বিশেষ অসুস্থ তাই সংক্ষেপে জন্ম উৎসব হল।

ঠাকুর মাষ্টারকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। কথা বলতে বড় কষ্ট আস্তে আস্তে বললেন—তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি। সব্বাই যদি বল, এত কষ্ট দেহ যাক। তাহলে দেহ যায়।

কথা শুনে সকলে কাঁদল।

আজ মেয়েভক্তরা অনেক এসেছেন। তাঁরা ঠাকুর ও শ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন, কেউ কেউ ঠাকুরের পায়ে ফুল আবীর দিলেন। দুজন কিশোরী ঠাকুরকে গান শোনাল। জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।

মেয়েরা চলে গেলে নরেন্দ্র ঠাকুরকে বললেন—মেয়েদের সঙ্গ ঈশ্বরলাভের ভয়ানক বিঘ্ন।

রামকৃষ্ণ কিছু বললেন না। তাঁর বলা ফুরিয়েছে। এবার নরেন্দ্রই বলবে। তিনি সস্নেহে নরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পনেরোই আগস্ট ঠাকুর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের শেষ কথা বললেন: তোমাদের চৈতন্য হোক।

———